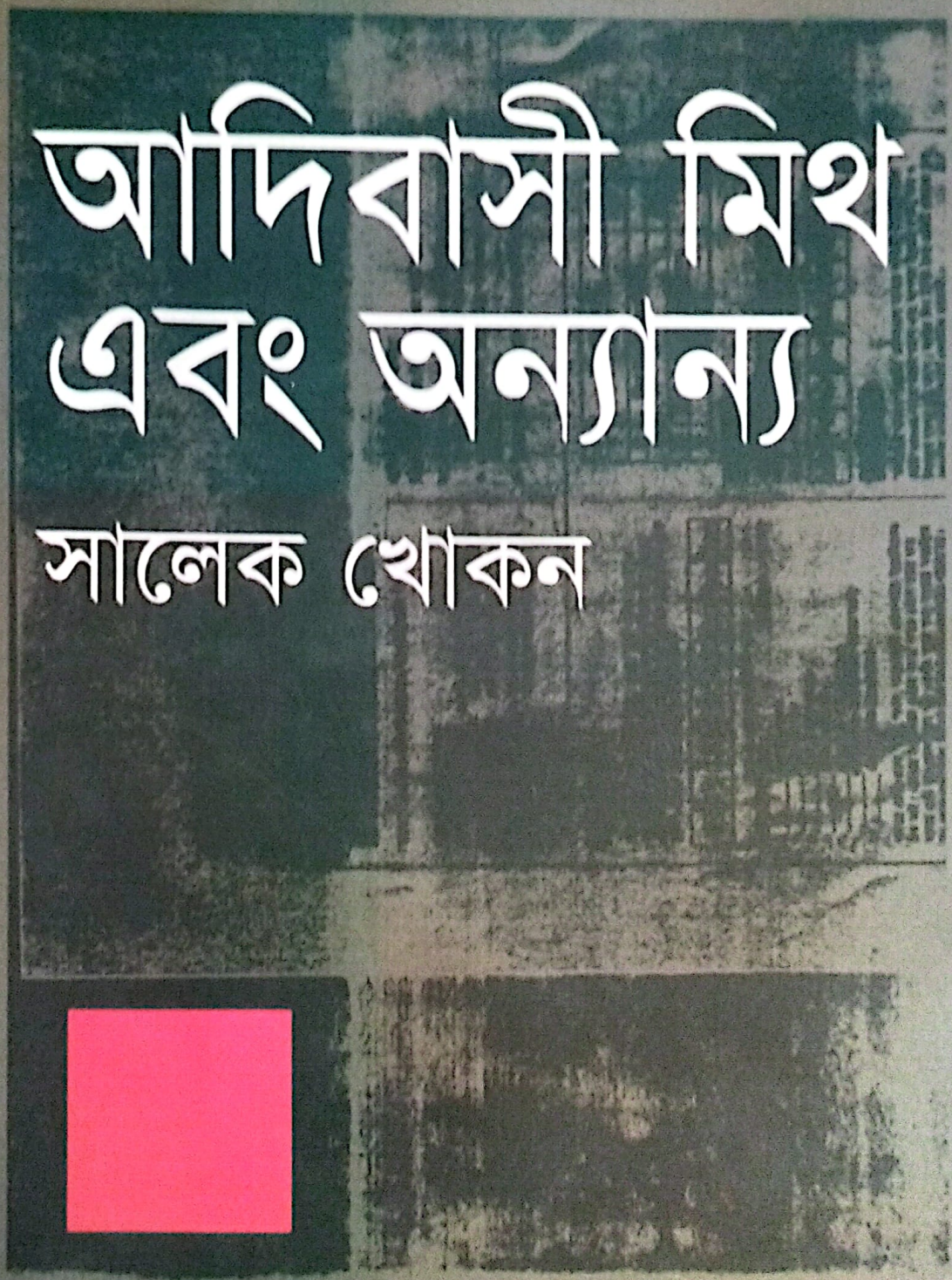
আদিবাসী মিথ এবং অন্যান্য

সালেক খোকন



এই পাঙ্গের বদ্বীপে আর্যদের আগমনের পূর্বে অন্তত আরো চারটি জাতি ছিল : নেগ্রিটো, অষ্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়। এ দেশে নিগ্রোদের মতো নৈষ্টিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এক আদিম জাতির বসবাসের কথা অনুমান করা হয়। সময়ের বিবর্তনে তাদের স্বকীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত। প্রায় সাড়ে পাঁচ কি ছয় হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক জাতি বাংলায় অনুপ্রবেশ চালিয়ে নেগ্রিটোদের উৎখাত করে। এরাই কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ড, পাহান প্রভৃতি আদিবাসীর আদি-পুরুষ।

অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির আমলে কিংবা কিছুটা পরে দ্রাবিড় জাতি এ দেশে এসে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতিকে গ্রাস করে ফেলে। অষ্ট্রো-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণেই আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এ প্রাক-আর্য জনগোষ্ঠীই বাঙালিদের তিন-চতুর্থাংশের বেশি দখল করে রয়েছে। আর্যদের পর এ দেশে মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে। কিন্তু বাংলার মানুষের রক্তের মধ্যে তাদের রক্তের মিশ্রণ খুব বেশি নয়। বাংলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এদের অস্তিত্ব রয়েছে। গারো, কোচ, ত্রিপুরা, চাকমা ইত্যাদি আদিবাসী এ গোষ্ঠীভুক্ত।

কালের বিবর্তনে এইসব আদিবাসী এখন সংখ্যালঘু। সংখ্যাগুরুদের প্রভাব এবং নিপীড়নে তাদের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন। লুপ্ত হচ্ছে তারা এবং তাদের ভাষা, সংস্কৃতি। হাজার হাজার বছর ধরে যেসব বিশ্বাস প্রচলিত ছিল তাদের মধ্যে, হারিয়ে যাচ্ছে সেগুলোও। সেসব বিশ্বাস বা মিথ বা লোককথা যেমন অভিনব তেমনি বিস্ময়করও। লেখক ও গবেষক সালেক খোকন নিরন্তর গবেষণার মাধ্যমে আদিবাসীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সংগ্রহ করেছেন সেসব মিথ। কখনো ভ্রমণকথার ছলে, কখনো-বা গল্প বলার ছলে ঝরঝরে গদ্যে তিনি কড়া, সাঁওতাল, ভুলুয়ার, ওরাও, ত্রিপুরি ও মাহালীদের মিথগুলো লিপিবদ্ধ করেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে আদিবাসীদের বসন-ভূষণ, খাদ্যাভ্যাস, আচার-অনুষ্ঠান, গোত্র পরিচালনা, জীবনযাপন পদ্ধতি, টিকে থাকার সংগ্রামের চিত্রসহ নানা বিষয়।

ঐতিহ্যানুসন্ধানী পাঠক তো বটেই, সাধারণ পাঠকের জন্য আদিবাসীদের মিথ ও অন্যান্য গ্রন্থটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য একটি গ্রন্থ।

প্রচ্ছদ : নিরাজ চৌধুরী তুলি

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
মালাপাড়ি।
অন্তর্ভুক্তি নং ৬৪৩২
কাটলগ নং ৬।বি
গ্রহণের তারিখ ৩০/৮/২১
লাইব্রেরীয়ানের স্বাক্ষর

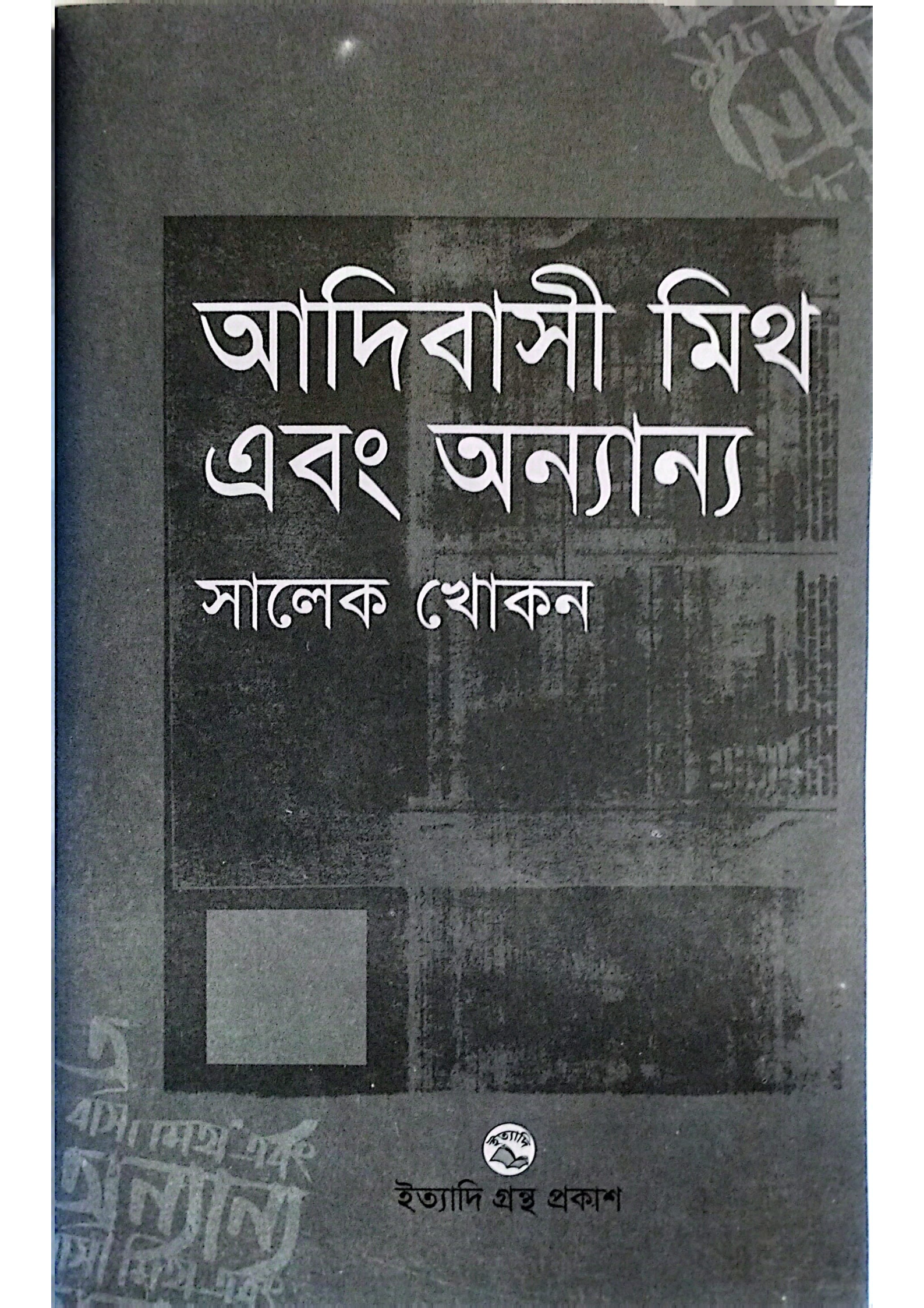


আদিবাসী মিথ
এবং
অন্যান্য



আদিবাসী মিথ এবং অন্যান্য

সালেক খোকন



ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

আদিবাসী মিথ এবং অন্যান্য
সালেক খোকন

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com

প্রচ্ছদ
নিয়াজ চৌধুরী তুলি

অক্ষরবিন্যাস
ইত্যাদি কম্পিউটার

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৩৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য
২০০ টাকা

ISBN : 984 70289 0175 6

উৎসর্গ

আমার মা সাবিহা বেগম-কে



গ্রন্থাগার

ভূমিকা

লেখালেখির প্রতি ঝোঁক ছিল ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু আদিবাসীদের নিয়ে লিখব কখনও ভাবি নি। সরকারি চাকরির সুবাদে বদলির ধাক্কা সামলাতে হয় সবসময়ই। সেই বদলির সুবাদে লেখালেখি শুরু করার বছর তিনেক আগে বদলি হয়ে আসি দিনাজপুরে। এর আগে ছিলাম ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে। সেখানেও খুব কাছ থেকে দেখেছি চাকমা আর গারোদের জীবনপ্রবাহ। দিনাজপুরে নানা ভাষাভাষী আদিবাসীদের বাস। গোটা জেলায় পাড়াভেদে বাস করছে কড়া, ভুনজার, তুরি, মাহালি, সাঁওতাল, ওরাও, মুণ্ডা পাহান আর মুসহর সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা। কাজের ফাঁকে এসব আদিবাসীদের সাথে দেখা হয়, কথা হয়। তাদের সাথে সখ্যতা গড়তেই সুযোগ মিলে তাদের পূজাপার্বণ দেখার আর মনের ভেতর জমে থাকা কষ্টের কথাগুলো শোনার। খুব কাছ থেকে দিনের পর দিন দেখেছি তাদের জীবনযাপন, গোত্র পরিচালনা, প্রতিবাদ আর নানা বিশ্বাসের নানা লোকাচারগুলো।

মূলত তাদের দলবদ্ধতা, সততা, পরিশ্রম আর সরলতা আমার মনে দাগটানে। আগ্রহী হই তাঁদের প্রতি। সে থেকেই আদিবাসীবিষয়ক লেখালেখি শুরু। এই বইয়ে তুলে আনার চেষ্টা করেছি কাছ থেকে দেখা আদিবাসীদের জীবন, সংগ্রাম, বিশ্বাস আর প্রতিবাদগুলোকে। পাশাপাশি তাদের বিশ্বাসের মিথগুলোকে। অনেকটাই গল্পের মতো করে।

বইটির প্রায় সবগুলো লেখাই বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময় ছাপা হয়েছে। *সাপ্তাহিক*-এর সম্পাদক মোর্তজা ভাইয়ের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। দু-বছর ধরে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তিনি আমার লেখা ধারাবাহিকভাবে ছাপিয়ে উৎসাহিত করেছেন। একইভাবে কৃতজ্ঞ *দৈনিক সমকাল*-এর সাহিত্য সম্পাদক ফারুক আহমেদ, *কালের কণ্ঠ*'র শামীম রেজা আর *মানবজমিন*-এর নির্বাহী সম্পাদক কাজল ঘোষের প্রতিও। ছড়াকার মৃদুল আহমেদ সব সময়ই উৎসাহী বন্ধু। লেখক ও কবি আজাদুর রহমান এবং তরুণ সাহিত্যিক স্বকৃত নোমানের নাম না বললেই নয়। *প্রথম আলোর* ডিপুটি চিফ ফটোজার্নালিস্ট মনিরুল আলমকে ধন্যবাদ, যার পরামর্শ না পেলে হয়তো আদিবাসীদের এমন ছবি যুক্ত করা সম্ভব হতো না। আমার সহধর্মিণী প্রায় প্রতিটি লেখারই প্রথম পাঠক। আদিবাসী নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার দু-কন্যাও বাবার কাছ থেকে এক ধরনের বঞ্চনার শিকার হয়েছে। তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সালেক খোকন

সূচি

আদি বিশ্বাসের আদি মানুষেরা / ১১
নানা বিশ্বাসে আদিবাসীদের মিথ / ২১
বর্ণহীন ভাষার আদিবাসীরা / ২৬
সাঁওতাল সর্দার পাঁড়ু রাজার বিদ্রোহ / ৩১
লোহাডাংগার আদিবাসী তুরিদের কথা / ৩৬
হুল হুল কেন বলে সিদু! / ৪১
আদিবাসী ভুনজারদের জিন্দা দেবতা / ৪৫
কড়া : নিশ্চিহ্নপ্রায় এক আদিবাসী সম্প্রদায় / ৫০
বাহাপরব / ৬৭
এক মুক্তিযোদ্ধা আদিবাসীর খোঁজে / ৭১
ভাষা হারানোর শঙ্কায় আদিবাসী মাহালিরা / ৭৬
হামনি ওরাও জাতি / ৮১
সাঁওতালি সোহরাই উৎসব / ৮৬
মহৎজাতি আদিবাসী মুণ্ডা পাহান / ৯০
কুকরী বনে আদিবাসী সাঁওতালদের জীবন / ৯৬
পিপল্লা গ্রামের ভুনজারদের জীবন / ১০০
গিরিডোবার সাঁওতালি হাঁড়িয়া / ১০৫
নিভৃত এক মুক্তিযোদ্ধা আদিবাসীর গল্প / ১০৯
দুলালী মারডির বিয়ে / ১১৪
ওরাও বিশ্বাসে উল্কি ও সিঁদুর / ১১৯
মুল্লুক দেওয়ান ও শালবনের আদিবাসীরা / ১২৪
আদিবাসীদের বিশ্বকাপ ফুটবল ভাবনা / ১২৯
মাহালিদের বিশ্বাস ও নানা আচার / ১৩৪
সাঁওতালি বিশ্বাসে নানা কাহিনী / ১৩৯
গল্পের মতো মিথগুলো / ১৪৩
মৃত্যু ছিল না যে সম্প্রদায়ে / ১৫১
আদিবাসী শিশুশিক্ষা : বাংলা ভাষার জাঁতাকলে / ১৫৬



আদি বিশ্বাসের আদি মানুষেরা

মাঘ মাস। শীতে কাঁপছে গোটা দেশ। অথচ মাস শেষ হতে এখনো আটাশ দিন বাকি।

বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে আজ। দেশের আনাচে-কানাচে এই নিয়ে চলছে তুমুল আলোড়ন, চলছে গ্রহণ দেখার নানা আয়োজন। এই আলোড়নের কারণও আছে। আজ থেকে আবার ১০৫ বছর পরে এ দেশ থেকে দেখা যাবে এরকম সূর্যগ্রহণ। তাই গ্রহণ দেখাটা রূপ নিয়েছে রীতিমতো উৎসবের।

কিন্তু দিনাজপুর শহরে নেমেই থমকে গেলাম রীতিমতো। কোথায় গেল সেই উৎসবমুখর মানুষেরা? সূর্যগ্রহণ নিয়ে কি এদের আগ্রহ নেই কোনো? নাকি শীতের ভয়েই ঘরের ভিতর পালিয়ে আছে সবাই?

সেরকম ভাবার কারণ আছে। কারণ কুয়াশার ভারি পর্দার নিচে জড়সড় হয়ে আছে গোটা জেলা। শহরবাসীর শরীরে শীত-পোশাকের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। পরিচিতজনদের চিনতেও খানিকটা বেগ পেতে হচ্ছে। সোয়েটার, মাফলার আর নাক অবধি মাঙ্কি ক্যাপে বদলে যাওয়া মানুষটাকে চিনতে চোখ দুটি শেষ ভরসা। বাস থেকে নেমে সেভাবেই চোখের ইশারায় চিনে নিলাম শামীমকে। জেলার প্রতিভাবান সংস্কৃতিকর্মী সে।

রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা চায়ের দোকান। ছোট ছোট সব গ্লাস সাজানো। পাম্প চুলায় শোঁ শোঁ করে আগুন জ্বলছে। গলগলিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে কেটলির নল দিয়ে। এমন দৃশ্য দেখলেই তো চা খাওয়ার তৃষ্ণাটা আরো বেড়ে যায়।

আমি আর শামীম বসে গেলাম ঝটপট। এক গ্লাস গরম চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিলাম আমরা।

স্টার্ট দিতেই ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটে চলল শামীমের মটরসাইকেল।

শহরটাকে পিছনে ফেলে অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম পুনর্ভবা ব্রিজটিতে।

চর পড়ার কষ্ট নিয়ে মরে যাওয়া নদী পুনর্ভরার বুকে চলছে বালিভর্তি বড় বড় লরি। ব্রিজ পেরিয়ে সোজা দক্ষিণমুখো বিরলের পথ। দুদিকে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ। ধান কাটার পর নিঃস্ব বুকে পড়ে আছে সেগুলো।

পশ্চিমা বাতাসের ঝাপটায় হিম হয়ে আছে চারপাশের গ্রামগুলো। কিছু লোক খোলা মাঠে প্যান্ডেল তৈরিতে ব্যস্ত। পাশেই টাঙ্গানো ব্যানারে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'ইসলামিক জলসা।' শীতের এ সময়টাতে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে চলে মেলা, যাত্রাপালা, নাটক আর ইসলামিক জলসার মতো আয়োজন। প্রচণ্ড শীতে মাঠের গরু-ছাগলগুলো পড়ে আছে বাহারি কাপড়ের তালি দেয়া বিশেষ পোশাক। স্থানীয়দের ভাষায় এটি 'ঝুল।'

এসব দৃশ্য দেখতে দেখতেই রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলছি। যতই এগোচ্ছে আমাদের মোটরসাইকেল, রাস্তায় জনমানব ততই কমে যাচ্ছে। প্রায় এক ঘন্টার পথ পেরিয়ে একসময় শামীমের মোটরসাইকেল থেমে গেল রাস্তার পাশে। আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের গন্তব্যে।

জায়গার নাম বহবলদিঘি। যখন পৌঁছালাম, মাথার ওপর তখন মধ্য দুপুরের সূর্য। একপাশে সীমান্ত অবধি গহীন শালবন আর অন্য পাশে আদিবাসীদের গ্রাম। সেখানেই পাড়া ভেদে বাস করে নানা ভাষাভাষীর আদি মানুষেরা।

চারপাশ থেকেই মাদল, ঢোল আর আদিবাসী ভাষায় চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছিল। আমরা ভাবছি কোনো পূজার আনুষ্ঠানিকতা চলছে হয়তো। কিন্তু হালজার একটি পাড়ায় ঢুকতেই আমরা অবাক হয়ে গেলাম।

দিনাজপুরে আমরা একটু আগেই দেখে এসেছি সূর্যগ্রহণকে ঘিরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু এখানে ঠিক তার উল্টো। গোটা পাড়ার সকলেই ধূপ জ্বালিয়ে, মাদল-ঢোল বাজিয়ে, বাড়ির চালে পানি ছিটিয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'মামা, গাহানা ছাড়'!

জিজ্ঞেস করে জানলাম, 'কড়া' সম্প্রদায়ের লোক এরা। সূর্যগ্রহণ চলায় গোটা পাড়ার সকলেই উপোস। সেই উপোস অবস্থাতেই এই

লোকাচার উৎসবে অংশ নেয়াই নিয়ম। গোত্রের প্রধানকে এরা বলে 'মাহাতো'। আলাপ হলো সেই মাহাতোর সাথে।

কড়া মানে কি? জগেন বলতে থাকে। কড়া মানে 'মাটি খোঁড়া'। এক সময় এ সম্প্রদায়ের লোকেরা দিঘি খোঁড়ার কাজে যুক্ত ছিল। সে থেকেই এরা 'কড়া'। ইংরেজ আমলে সারা ভারতজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বসেছে রেললাইন। পাহাড় কেটে, মাটি খুঁড়ে সেই রেললাইন বসানোর কাজে ঘাম ঝরিয়েছে এই আদিবাসীরাই। আর সেই রেললাইনের কাজ করতে করতেই ব্যাপক পরিমাণ আদিবাসী চলে আসে এ দেশে। বসতি গাড়ে, নিজেদের সংস্কৃতি আচার-আচরণকে বাঁচিয়ে রাখতে সবাই মিলে থাকতে শুরু করে একসাথেই।

জীবিকার তাগিদে দেশছাড়া সেই আদিবাসীরাই এদের পূর্বপুরুষ। নানা কারণে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে এ সম্প্রদায়টি। সারা দেশজুড়ে এ সম্প্রদায়ের মাত্র ১৯টি পরিবার টিকে আছে।

নানা বিশ্বাসের প্রভাবে এদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে নানা আচারের। তারই ধারাবাহিকতায় চলছে এই গ্রহণমুক্তির চেষ্টা। কেন এই সূর্যগ্রহণ হয় সে বিষয়ে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মতো কড়াদের রয়েছে আদি বিশ্বাস ও



ওরাও সম্প্রদায়ের দুই প্রজন্ম

কাহিনী। ৯০ বছরের সেড়তি কড়া কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শুরু করল সে কাহিনীটি।

'মানবজাতি একবার খুবই অভাবের মধ্যে পড়ে। মানবজাতিকে বাঁচানোর জন্য চাই ধান। চন্দ্র এবং সূর্য মানুষের জন্য ধান দিতে অনুরোধ করে দোসাদ দেবতাকে। তাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে দোসাদ দেবতা ধান দেয় মানুষকে, তবে আবার ফেরত দিতে হবে এই শর্তে। কিন্তু সে বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মানবজাতি সে ধার আর পরিশোধ করতে পারে না। চন্দ্র ও সূর্য মানবজাতির পক্ষে সেই ধান ধার নিয়েছিল বলে দোসাদ দেবতা এখনো সুযোগ পেলেই চন্দ্র ও সূর্যকে আক্রমণ করে। এতে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ঘটে।'

এ কারণেই কড়ারা মনে করে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় মানবজাতির দায়িত্ব তাঁদের বাঁচাতে ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করা।

বেলা বাড়ছিল ক্রমশই। কথাও জমে উঠছিল বেলার সাথে সাথে। তাদের কাছ থেকেই জানলাম, কড়াসহ নৃগোষ্ঠীর কোনো সম্প্রদায়েরই লিখিত বর্ণ নেই। পুরোটাই মৌখিক। মায়ের ঘুম পাড়ানির গান আর বাবার আদরের ভাষা শুনে শুনেই শিশুরা তাদের জাতির ভাষা শিখে ফেলে।

আমাদের আগ্রহ দেখে পাশ থেকে সুনিয়া কড়া গাইতে শুরু করল তাদের ভাষার ঘুমপাড়ানির গানটি—

'ইরারে ভিম চড়ওয়া ভিমা পার দে
নুনুক বনামে আগ লাগাল নুনু নিন্দারে দে।'

গানের কথার অর্থ হচ্ছে এরকম : কোকিল পাখিকে ডাকা হচ্ছে, সে যেন তার ভিম পাড়া শেষ করে চলে আসে এই শিশুটির বিছানায়। আর তারপর তা দিয়ে গরম করে দেয়া বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে দেয় শিশুটিকে।

তাদের উৎসবের অংশ হিসেবেই এবার তাদের মধ্যে চলতে থাকে ধাঁধার খেলা। একপাশ থেকে সেড়তি বলল, 'দাশটা মারাত রাগদেলকে, দুটা মারত পাকারকে মারকে।'

এর উত্তর বলতে পারল না কেউ। সবাই চুপ।

কেউ না পারায় সেড়তির মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল। হাসতে হাসতেই উত্তর দিল সে, 'ঢিলা বাছা'।

মানে উকুন আনা— দুই হাতের দশ আঙ্গুল থাকলেও উকুন মারা হয় দুই আঙ্গুল দিয়ে।

এবার সুনিয়া বলল আরেকটি ধাঁধা, 'ভুরুত পাংখি, একজন ডুবেলকে দুজন সাক্ষি।'

দলের মাহাতো বলল, এটি হচ্ছে সেচ দেয়ার জন্য টিন জাতীয় বালতি বিশেষের দুই দিকে দড়ি বেঁধে দুইজন টেনে ধরা।

এরকমভাবে চলতেই থাকল উৎসবের একের পর এক লোকাচার।

এরই মধ্যে আমরা কড়াপাড়া থেকে বের হলাম। হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়লাম গিরিডোবার ওরাও পাড়ায়। ভাঙাচোরা রাস্তার দুদিকে সারি সারি তুতগাছ। পথেই দেখা মিলল নিপেন টিগ্গার। নিপেন টিগ্গা এই ওরাও পাড়ারই একজন। সে আমাদের জানাল, প্রায় ৩০টি পরিবারের বাস এখানে। পরিবারের দরিদ্রতা থেকে মুক্তি পেতে, চিকিৎসা সহায়তা পেতে আর বিনামূল্যে বাচ্চার শিক্ষাপ্রাপ্তির প্রলোভনে কয়েকটি পরিবার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও অধিকাংশই পালন করছে তাদের পূর্ব পুরুষদের আদি ধর্ম।

চন্দ্র ও সূর্য ওরাওদের দেবতা। ওরাও ভাষায় বিড়ি নাদ ও চান্দু নাদ। চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি নিয়ে এদের বিশ্বাসে আছে প্রাচীন এক কাহিনী। আধো কুরুক ও আধো বাংলায় নিপেন বলতে শুরু করল কাহিনীটি—

ধরমেশ যখন পৃথিবী সৃষ্টি করল তখন আকাশ ও মাটি ছিল খুবই কাছাকাছি। মানুষ চলাফেরা করার সময়ই আকাশ মাথায় ঠেকতো।



গৃহের দেবতাকে সেজদা দিচ্ছে এক মুসহর

একবার মানুষের কোনো এক অপরাধে আকাশ উপরে উঠে গেল। এতে চলাফেরায় মানুষের সুবিধা হলেও সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

বনের মধ্যে ছিল এক মহুয়া গাছ। সে গাছে ফুল যতক্ষণ ফুটে থাকত ততক্ষণ পৃথিবী আলোকিত থাকত। আর যখন ফুল শুকিয়ে যেত তখন আবার অন্ধকার নেমে আসতো।

সবাই ভাবল, গাছটিই অন্ধকারের মূল কারণ। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, গাছটিকে কেটে ফেলে আলো উদ্ধারের।

গাছটিকে কাটা হলো। কিন্তু তারপরও সেটি মাটিতে পড়ছে না। দৈববাণীর মাধ্যমে জানা গেল গাছটিতে রয়েছে চিলের বাসা। চিলটিকে না মারলে গাছটি মাটিতে পরবে না। তাই হলো। চিলটিকে মারার পরপরই গাছটি মাটিতে পড়ে গেল। পড়ার শব্দে কেঁপে উঠল গোটা পৃথিবী।

সে দেশের রাজা ভাবল, শত্রুরা তার রাজ্য আক্রমণ করেছে। তিনি সৈন্য নিয়ে এসে দেখলেন মহুয়া গাছটি কাটা। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে শাস্তির হুকুম দিলেন। উভয়পক্ষের সাথে চলল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। রাজার সৈন্য পরাজিত হলো।

অতঃপর গাছটিকে দুই ভাগ করে কাটা হলো। দেখা গেল নিচের দিকের বড় অংশটিতে সূর্য আর উপরের দিকের ছোট অংশটিতে চন্দ্র।

কিন্তু তাদের জীবনদান হবে কীভাবে?

আবারও দৈববাণী এলো। এক চাষীর আদরের পুত্রকে চুরি করে এনে হত্যা করে তার রক্ত ঢেলে দেয়া হলো গাছের কাটা অংশে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্য জীবিত হয়ে আকাশে উঠে গেল।

সে সময় থেকেই ওরাওরা মনে করে সূর্য পুরুষ এবং সে বেশি রক্ত পান করেছিল বলে তেজী ও লাল। একইভাবে চন্দ্র নারী এবং সে কম রক্ত পান করেছিল বলে স্নিগ্ধ ও সাদা।

ওরাও গ্রামের পাশেই নিপেন দেখিয়ে দিল সাঁওতাল পাড়াটি। এ পাড়াটিতেই ঐতিহাসিক পাড়ু রাজার বিদ্রোহ হয়েছিল।

পাড়ার ভিতর ঢুকতে ঢুকতে মনে পড়ল সাঁওতালদের বিষয়গুলো। এরা নিজেদের 'সানতাল' বলতেই অধিক পছন্দ করে। নিজেদের মধ্যে এরা একে অপরকে ডাকে 'হর' বলে। 'হর' অর্থ 'মানুষ'। এদের আদি দেবতা সূর্য। সাঁওতালি ভাষায় 'সিং বোঙ্গা'। সূর্য পূর্বদিকে ওঠে বলেই

পূর্বদিক সাঁওতালদের কাছে পবিত্র। তাই পূজাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এরা পূর্বদিকে মুখ করে বসে।

এখনো শিকারসহ যে কোনো অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে নৃগোষ্ঠীদের একমাত্র অস্ত্র তীর-ধনুক। এছাড়া নানা পূজা-পার্বণেও এরা তীর-ধনুককে ব্যবহার করছে পূর্বপুরুষদের আমল থেকে। শিকারসহ তীর-ধনুকের ব্যবহার নিয়ে প্রচলিত আছে একটি কাহিনী বা উপকথা। গোত্রের ষাটোর্ধ্ব রাগদা হেমব্রন গল্পের ছলে বলতে থাকল কাহিনীটি—

সাঁওতাল রাজা তখভনের রানীর এক গোপন প্রেমিক ছিল। প্রেমিকটি বনের মধ্যে থাকতো সর্পরাজের বেশ ধরে। রাজা যখন শিকারে যেতেন রানী তখন তাকে জঙ্গলের বিশেষ একটি দিকে যেতে নিষেধ করতেন।

একবার শিকার করতে গিয়ে কৌতূহলবশত রাজা ঐ বিশেষ দিকে যান এবং সর্পরাজকে দেখতে পান। নিজের প্রাণ রক্ষার্থে তীর দিয়ে রাজা হিংস্র সর্পরাজকে মেরে ফেলেন।

শিকার থেকে ফিরে রাজা ঘটনাটি রানীকে খুলে বলে। সর্পরাজের মৃত্যুর কথা শুনে রানী ভিতরে ভিতরে বেশ ব্যথিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণা হয়ে ওঠেন। তিনি রাতের আঁধারে জঙ্গলে গিয়ে সেখান থেকে সর্পরাজের



শিকারে ব্যস্ত কড়া সম্প্রদায়ের রঞ্জন কড়া

হাড়গোড় কুড়িয়ে এনে বাগানে পুতে রাখেন। কিছুদিন পর ঐ জায়গা থেকে একটি গাছ হয় এবং ঐ গাছে একটি আধফোটা ফুল সারা বাগানকে আলোকিত করে তোলে।

প্রতিহিংসাপরায়ণা রানী একবার কৌশলে রাজার সাথে মেতে ওঠেন সর্বনাশা বাজির খেলায়। রাজা যদি বাগানের সব ফুলের নাম বলতে না পারেন, তবে রানীর হুকুমে প্রজারা রাজার প্রাণদণ্ড দেবে। নিজের বাগানের ফুলের নাম বলাটা খুবই সহজ ভেবে আত্মবিশ্বাসী রাজা রাজি হলেন।

অতঃপর গ্রামে গ্রামে ঢোল পিটিয়ে এ খবর সর্বত্র জানিয়ে দেয়া হলো। নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যের প্রজারা 'বাজি খেলা' দেখার জন্য রাজপ্রসাদের বাগানে উপস্থিত হলো। রাজা একে একে সব ফুলের নাম বলতে পারলেন কিন্তু অদ্ভুত আধফোটা ফুলটির কাছে এসে রাজা আটকে গেলেন। সে সময় রাজার পক্ষে প্রজারা রানীর কাছ থেকে আরো ৭ দিন সময় চেয়ে নেয়। খবর পেয়ে রাজাকে বাঁচাতে অন্য রাজ্য থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হয় রাজার এক বোন। হাঁটতে হাঁটতে ষষ্ঠ রাতে সে বিশ্রাম নিচ্ছিল একটি শিমুল গাছের তলায়। হঠাৎ গভীর রাতে বোনটি শুনতে পায় গাছের মগডালে এক শকুনি তার ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন এই বলে যে, পরদিনই সে বাচ্চাদের জন্য রাজার দেহের মাংস তাদের খাওয়াবে। উৎসুক বাচ্চারা কিভাবে তা সম্ভব মার কাছে জানতে চাইলে গল্পচ্ছলে বাচ্চাদের ঘুম পাড়াতে পাড়াতে সমস্ত ঘটনা এবং ফুলের নাম ও জন্ম বৃত্তান্ত খুলে বললো। শিমুল গাছের নিচে বসে রাজার বোনটি সব কথা শুনে ফেললো।

ভোরের মধ্যেই বোনটি রাজার কাছে পৌঁছে ফুলের নামসহ সমস্ত ঘটনাটি বলল। ৭ দিনের দিন রাজা প্রজা ও রানীর সম্মুখে বললেন, ফুলের নাম হলো, 'কারি নাগিন হাড় বাহা' আর তখনই ফুলটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হলো। রাজা প্রাণদণ্ড হতে মুক্তি পেল।

কিন্তু ক্ষুব্ধ প্রজারা প্রতিহিংসাপরায়ণা রানীকে তীর মেরে ঝাঁঝরা করে দিল এবং তাতেও তাদের ক্ষোভ প্রশমিত না হওয়ায় লাঠির আঘাতে রানীর মাথা গুড়িয়ে দিল।

সেই থেকে সাঁওতালদের শাকরাৎ-এর সময় কলাগাছে তীর মারা ও লাঠির ঘায়ে হাঁড়ি ভাঙাকে এরা অশুভ শক্তির প্রতীকী বিনাশ বলে মনে করে। এমনিভাবে সাঁওতালরা বিশ্বাস করে, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে সমগ্র দুনিয়া

জলে ঢাকা ছিল। সৃষ্টিকর্তা পৃথিবী তৈরির সিদ্ধান্ত নিলে তাকে সাহায্য করে কেঁচো ও কচ্ছপ।

কেঁচো জলের তলদেশ থেকে মাটি এনে কচ্ছপের পিঠের ওপর রাখতে থাকে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল বিশাল পৃথিবী। অতঃপর সৃষ্টিকর্তা তৈরি করলেন আদি পিতা ও মাতাকে। পিতামাতার জোড়ায় জোড়ায় সন্তান জন্মের মাধ্যমে গড়ে উঠল সমগ্র মানবজাতি।

সাঁওতালপাড়া থেকে যখন বের হলাম তখন সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই। চারদিকের গ্রামগুলোতে থেমে থেমে বাজছিল মাদল আর ঢোলগুলো। ফেরার পথে লোহা ডাংগায় ঢুকে দেখি উঠানের বোঙ্গায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিচ্ছে একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা। এরা তুরি সম্প্রদায়। এ গোত্রের মহত লবানু সিং। পুরুষদের নামের শেষে এরা 'সিং' ব্যবহার করলেও নারীদের নামের শেষে টাইটেল হিসেবে ব্যবহার করা হয় 'বালা'।

একজন লোকের আর্তচিৎকারে আমরা প্রায় দৌড়ে চলে গেলাম মহতের পাশের বাড়িটিতে। সেখানে সাপে কাটা এক রোগীর শরীর থেকে বিষ নামাচ্ছিল মহতেরই ভাই সবানু সিং। বিশেষ ভঙ্গিতে পড়ছেন তাদের ভাষায় মন্ত্র—



আদিবাসী নারীদের উঁকুন বিনোদন

'এখানি পুসকেননি চারি খানি ঘাট
তাতে দিনু পদ্মার পাত
পদং কুমারী মা-বাপার নাম— জয় বিষহরি
নাব বিষ নাব
বত্রিশে গড়ে গড়ে নাব
নিচ থাকি উপারে যদি ধাউবো
দোহার লাগে— শিব, দুর্গা, কার্তিক, গণেশের মাথা খাবো।'

মুণ্ডা, ভুনজার, ওরাও আর কড়াদের মতো তুরি সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় পূজার নাম কারমা। ভাদ্র মাসে হয় এই পূজাটি। পূজার পূর্বে মেয়েদেরকে তার স্বামীর বাড়ি থেকে দাওয়াত করে নিয়ে আসে তার ভাই ও বাবা। তাই ভাদ্র মাসে চারদিকে যখন কাশ ফুল ফুটতে থাকে তখন মেয়েদের মনে বাবার বাড়ি যাওয়ার আনন্দের ঢেউ। মনের এই আকুতি নিয়ে করমা পূজার সময় দলবেঁধে তারা গায় নানা গান।

আমাদের শোনাতে বাসন্তি বালা সুর করে গাইতে থাকে—
'কাশি ফুলা ফুটেই গেলে
আসা মরা লাগি গেলে
ভাইয়া বাপা লেগেল আতে বেটিক
কারমা পূজাকে রাতে।'
পাশ থেকে খিরো বালা ধরেন আরেকটি গান—
'করম ডাল, করম ডাল
চল শশুড়ায়ে
ভাদ্র মাসে বিয়া হতে গো
আনে ঘুরায়ে।'

তুরিদের গানের আসর থেকে যখন ফিরছি তখন চারদিকে নিস্তব্ধ অন্ধকার। আকাশে অজস্র তারা। হঠাৎ থমকে গেলাম। চোখের সামনেই আকাশের একটি তারা খসে পড়ে। আবার তা নিমিষেই হারিয়ে যায়। দূরে কোনো একটি গ্রাম থেকে ভেসে আসে আদি মানুষের সূর— 'হে ভগবান, পতিসে পাবনে সিতারাম, জেয় ভগবান।'

দৈনিক কালের কণ্ঠ, শিলালিপি, ১২ মার্চ ২০১০



নানা বিশ্বাসে আদিবাসীদের মিথ

ভাদ্র মাস। তাল পাকানো গরম চারদিকে। গ্রামের লোকসকল বার কয়েক ঘাম-গোসল দিয়ে গাছের ছায়ায় খানিকটা ঝিরিয়ে নিচ্ছে। কালিয়াগঞ্জ গ্রামটি বেশ ছায়াঘেরা। পাশেই ব্রিটিশ আমলের গহীন সবুজ শালবন। শোনা যায় গোটা গ্রামটিই এক সময় ছিল জঙ্গল। আর সে সময় থেকেই এখানে বাস করছে নানা সম্প্রদায়ের আদিবাসী। বনের হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতো এরা। গোত্রে গোত্রে ভাগ হয়ে স্বাধীনভাবে পালন করতো পূর্বপুরুষদের আদি সংস্কৃতি। বাঙালি থাকলেও দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী এই গ্রামটিতে এখনো আদিবাসীদের সংখ্যাই বেশি। প্রতি শনি আর বৃহস্পতিতে এখানকার গ্রাম্য হাটে ঢল নামে নানা ঢংয়ের নানা ভাষাভাষি মানুষদের। সাঁওতালদের আধিক্য থাকলেও গোত্রভেদে বাস করছে মুণ্ডা, ওরাও, ভুনজার, তুরি, মাহালি আর কড়া সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা।

আমরা বের হয়েছি আদি মানুষদের খোঁজে। কালিয়াগঞ্জ যখন পৌঁছলাম তখন মধ্য দুপুর। ভাদ্র থেকে কার্তিক এখানকার আদিবাসীদের অভাবের মাস। আর এই অভাবের মধ্যেই এদের পালন করতে হয় নানা ধরনের পূজার আনুষ্ঠানিকতা। বিকেল হতেই চারপাশে থেমে থেমে বাজছিল মাদল, ঢোল আর মন্দিরা। ওরাও, তুরি, মুণ্ডা আর কড়া সম্প্রদায়ের গ্রামগুলোতে পুরোদমে চলছে 'কারমা পূজার' আয়োজন। জানা গেল এটি মূলত গাছের পূজা। বিরল প্রজাতির 'কারমা গাছ' (স্থানীয়দের ভাষায় 'খিল কদম' গাছ)-এর পূজা করে এরা। কড়া, ওরাও, মুণ্ডা আর ভুনজার সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের মধ্যে এ পূজা নিয়ে প্রচলিত আছে অভিন্ন এক কাহিনী। কি সে কাহিনী। আদি কাহিনী জানার আগ্রহে আদিবাসীরা মুগ্ধ হয়। অজানা সব পৌরাণিক কাহিনীর ঝুড়ি নিয়ে বট

গাছের নিচে বসে পড়েন জগেন কড়া, মানকি মুণ্ডা, দাও হাজদা আর টেম্পু টিগ্গা। সাদরি আর কুরুক ভাষায় চলতে থাকে কাহিনী বলার আসর। অন্ধকার নামতেই আসর আরো জমে ওঠে।

জগেন কড়া বলতে থাকে— কারাম আর ধারাম ছিল দুই ভাই। কারাম বড় আর ধারাম ছোট। তাদের একমাত্র আদরের বোনের নাম পারাবেতী। একবার ভাদ্র মাসে গ্রামের এক ধনী ব্যক্তি ঢোল পিটিয়ে তার জমিতে ধান গাড়ার 'হাউলি'র (কাজের বিনিময়ে খাওয়ার দাওয়াত) ডাক দেয়। গ্রামের অন্যদের সাথে কারাম আর ধারামও যায় সেখানে। ভোরবেলা কিছু চারা লাগিয়ে সকালের নাস্তা বা পনতা (পানতা) খেতে দুইভাই কলাপাতা নিয়ে বসে যায় লাইনে। কিন্তু কারাম আর ধারামের কাছে এসেই পানতা শেষ হয়ে যায়। পানতা খেতে না পেরে দুভাই বড়ই দুঃখ পায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বড়ভাই কারাম ছোটকে সান্ত্বনা দেয় দুপুরের খাবার পাওয়ার আশায়। দুভাই আবার কাজে ফিরে যায়। ধান গাড়া শেষ হলে দুপুরের দিকে আবারও কলাপাতা নিয়ে অন্যদের সাথে বসে পড়ে লাইনে। কিন্তু এবারও ঘটল একই ঘটনা। তাদের পর্যন্ত এসেই খাবার শেষ হয়ে গেল। এবার তারা খুবই কষ্ট পেল। প্রচণ্ড রাগে ও কষ্টে ছোটভাই চাইল তার গাড়া ধানের চারাগুলো তুলে ফেলতে। বড়ভাই কারাম তাকে শান্ত করে বাড়ির দিকে রওনা হয়। পথেই তাদের দেখা হয় এক বটগাছের সাথে। তাদের দুঃখের কথা শুনে বটগাছ বলে, 'তোদের কারমা কপাল জেড় গেল' (তোমাদের কর্মভাগ্য পুড়ে গেছে)। সে উপদেশ দেয় সাত সমুদ্র লংকা পার হয়ে কর্মভাগ্য নিয়ে আসার। বটগাছের কথা বিশ্বাস করে কারাম আর ধারাম বাড়ি থেকে ক্ষুদভাজা নিয়ে রওনা হয় কর্মভাগ্য আনতে। কিছু দূর যেতেই তাদের সাথে দেখা হয় একটি কুল গাছের। কারাম-ধারাম এর কথা শুনে সেও জানায় তার দুঃখের কথা। তার ফল পেকে মাটিতে পড়ে থাকে কিন্তু কেউ খায় না। তার ভাগ্যটিও জেনে আসার জন্য দুভাইকে সে অনুরোধ করে। যেতে যেতেই কারাম-ধারাম এর দেখা হয় একটি ডুমুর গাছের সঙ্গে। ডুমুর গাছ তাদের লংকা পার হওয়ার কথা শুনে দুঃখ করে বলে তার সুদৃশ্য ফল পেকে যায় কিন্তু মানুষ ও পাখি সেদিকে ফিরেও তাকায় না। এ নিয়ে তার অনেক দুঃখ। সে অনুরোধ করে তার ভাগ্যটিও জেনে আসার। কিছুদূর যেতেই কারাম আর ধারামের

সামনে পড়ে একটি নদী। নদীর তীরে দুটি হাতি মারামারি করছিল। তাদের পুরো শরীর কাদায় ঢাকা। কারাম-ধারামের কথা শুনে তারা দুঃখ করে বলে তারা জানে না আর কতদিন তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে কাদায় ঢাকা থাকবে। দুভাইকে তারা অনুরোধ করে তাদের ভাগ্যটিও জেনে আসার। নদী পার হয়ে কিছুদূর যেতেই কারাম-ধারাম লঙ্কার সমুদ্রের কাছে এসে পৌঁছায়। বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেয়ার চিন্তায় তারা সমুদ্রপাড়ে বসে থাকে। সমুদ্রে একটি বড় কুমিরের গলায় সাতদিন ধরে কাঁটা বিঁধে থাকায় সে কারাম-ধারামের সাহায্য চায়। সমুদ্র পার করানো ও নিয়ে আসার শর্তে কারাম-ধারাম কুমিরের গলার কাঁটা বের করে দেয়। কুমিরের পিঠে চড়ে দুইভাই লংকার সমুদ্র পার হয়েই দেখা পায় কর্মভাগ্যের। কর্মভাগ্যের সারা শরীর তখন পোকায় খাচ্ছিল। কারাম-ধারাম যখনই তা স্পর্শ করল তখনই সেটা গাছ হয়ে গেল। কারাম-ধারামের মধ্যে অন্যরকম শক্তির সঞ্চার হলো। তারা সেই গাছ ঘাড়ে নিয়ে ফিরতে থাকলো।

ফেরার পথে হাতি দুটো তাদের ভাগ্যের কথা জানতে চাইলে কারাম-ধারাম বলল, তোমাদের এমন একজন লাগবে যে তোমাদের শরীর



বোঙ্গায় প্রার্থনারত এক সাঁওতাল

পরিষ্কার করে দিবে। হাতি দুটি তাদেরকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার মিনতি করলো। কারাম-ধারাম তখন দুই হাতির পিঠে চড়ে বসল। এরপর ডুমুর গাছ তার ভাগ্যের কথা জানতে চাইলে তারা বলল, তোমার গোড়ার মাটির নিচে সাত কলসি ধন আছে সেটি সরালেই তোমার ফল সবাই খাবে। ডুমুর গাছ কারাম-ধারামকে সাত কলস ধন তুলে নেয়ার অনুরোধ করল। তারা সাত কলস ধন হাতির পিঠে তুলে নিল। কুল গাছের সাথে দেখা হতেই কারাম-ধারাম তাকেও একই কথা বলল। সেও তার গোড়ার মাটির নিচের সাত কলস ধন তুলে নেয়ার মিনতি করল। কারাম-ধারাম তাই করল। এভাবে তারা কর্মভাগ্য নিয়ে সেই বট গাছের কাছে চলে আসল। বটগাছ লঙ্কা পার হয়ে আনা কর্মভাগ্যরূপী গাছটিকে মাটিতে গেড়ে তাদের বোন পারাবেতীকে এনে পূজা করার নির্দেশ দিল। সে সময় থেকেই কারমা পূজার প্রচলন হয় এবং গাছটির নামকরণ হয় কারমা গাছ। আদিবাসীরা আজো বিশ্বাস করে কারমা পূজা তাদের অভাবমুক্তি আর সৌভাগ্য লাভের পূজা।

নানা কাহিনীতে যখন জমে উঠছিল আসর তখনই আমাদের সাথে যোগ দিল ভুনজার সম্প্রদায়ের মহত বাতাসু ভুনজার, তুরি সম্প্রদায়ের লবানু শিং আর মাহালি গোত্রের মহত আব্রাহাম হাজদা। শুধু গাছ নয় আদিবাসীরা গবাদিপশুর মঙ্গলের জন্যও করে থাকে বিশেষ ধরনের পূজা। সম্প্রদায় ভেদে মাহালিরা 'গারয়া', মুণ্ডারা 'ঘঠবঙ্গা', সাঁওতালরা 'সহরায়' আর ভূমিজরা 'বাদনা' পূজার মাধ্যমে গবাদিপশুর মঙ্গল কামনা করে থাকে। চমৎকার ভঙ্গিতে আব্রাহাম শুরু করে এ পূজার পৌরাণিক কাহিনীটি। শ্রীকৃষ্ণ একবার কোনো কারণবশত বৃন্দাবনবাসীদের ইন্দ্রপূজা করতে নিষেধ করেন। এতে দেবতা ইন্দ্র রেগে গিয়ে দিবারাত্রী মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করে। বৃষ্টির ফলে বৃন্দাবনে দেখা দেয় ভয়াবহ বন্যা। বন্যায় বৃন্দাবনবাসীর দুর্ভোগের শেষ থাকে না। বৃন্দাবনবাসীকে এই বিপদ থেকে রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গিরিকে বৃন্দাবনের উপরে ছাতার মতো করে ব্যবহার করে বৃষ্টিমুক্ত করেন। এতে দেবরাজ ইন্দ্র পরাজিত হয়। মূলত এ ঘটনার পর থেকেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসীদের কার্তিক মাসে অমাবস্যার পরদিন গিরি গোবর্দ্ধন এবং গো-জাতির পূজা করতে উপদেশ দেন। সে থেকেই পালন হচ্ছে এ ধরনের পূজা।

লবানু শিং জানায় যুগ যুগ ধরে আদিবাসীরা সূর্য ও চন্দ্রকে দেবতা হিসেবে পূজা করে আসছে। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় আদিবাসীরা পালন করে বিশেষ এক ধরনের পূজার আনুষ্ঠানিকতা। গ্রহণের সময় উপোস থেকে উঠানে ধূপ জ্বালিয়ে তুলসী ঠাকুরকে ভক্তি করে এরা। অতঃপর বাড়ির চালে পানি ছিটিয়ে ঢাক-ঢোল আর থালা-বাটি বাজিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে— 'ছাড় পাপী, ছাড়া পাপী, হে ভগবান, ছাড় ভগবান।' ওরাও সম্প্রদায়ের টেম্পু টিগ্গার মুখ থেকে শোনা যায় গ্রহণের কাহিনীটি। মানবজাতি একবার খুবই অভাবের মধ্যে পড়ে। চন্দ্র সূর্য দোসাদ দেবতার কাছে গেল মানবজাতির জন্য ধান ধার আনতে। দোসাদ দেবতা নানা শর্ত আরোপ করে মানবজাতির জন্য ধান দিল। কিন্তু সে বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মানবজাতি সে ধার পরিশোধ করতে পারল না। চন্দ্র-সূর্য সেই ধার নিয়েছিল বলে এখনো দোসাদ দেবতা মাঝে মাঝে চন্দ্র-সূর্যকে আক্রমণ করে। ফলে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের আবির্ভাব ঘটে। এ কারণেই গ্রহণের সময় আদিবাসীরা চন্দ্র ও সূর্যকে বাঁচাতে ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করে। এরা বিশ্বাস করে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চিৎকার করলে দোসাদ দেবতা ভয় পেয়ে দূরে সরে যায়।

রাত বাড়ার সাথে সাথেই বেড়ে যেতে থাকে আদিবাসীদের সংখ্যা আর মুখে মুখে চলতে থাকে তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের নানা কাহিনী। যুগে যুগে আদিবাসীরা নিজেদের বিশ্বাসকে অর্পণ করেছে নানা প্রাকৃতিক শক্তির ওপর। ফলে কাহিনীগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে সূর্য, চন্দ্র, পাহাড়, গাছ প্রভৃতি। এসব পৌরাণিক কাহিনীর বিশ্বাসকে ঘিরেই আদিবাসী ভাষায় তৈরি হয়েছে আদিবাসী গান, কবিতা আর ছড়া। মূলত কল্পকাহিনীগুলোই বাঁচিয়ে রেখেছে আদিবাসীদের জাতিসত্তাকে।

দৈনিক সমকাল, কালের খেয়া, ৮ জানুয়ারি ২০১০

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল সাংস্কৃতিক কমিটি
গ্রন্থাগার
রাঙ্গামাটি

বর্ণহীন ভাষার আদিবাসীরা

বহবলদিঘির কথা বলতেই বৃদ্ধ লোকটি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খানিক চিন্তা করেই মুচকি হেঁসে দেখিয়ে দেয় দক্ষিণমুখো ছায়াঘেরা একটি রাস্তা। এখানকার লোকেরা বহবলদিঘিকে বলে 'বগলডিগী'। দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী গ্রাম এটি। পাকা রাস্তার চারপাশে বড় বড় গাছ আর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে শুধুই ধান ক্ষেত। সোনালী-সবুজ রঙের থোকা থোকা ধান ঝুলছে চারপাশের মাঠগুলোতে। ধান কাটার দিন গুনছে সবাই। কৃষকদের মুখে আনন্দের গুপ্ত হাসি। গোটা বহবলদিঘিতেই নানা ভাষাভাষি আদিবাসীদের বাস। এখানকার গ্রামগুলোতে সারা বছর ধরে চলে আদি মানুষদের জীবন, সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রবাহের নানা আনুষ্ঠানিকতা। অনেকের কাছে বহবলদিঘি তাই 'আদিবাসী গ্রাম'।

একটি ছোট চায়ের দোকানে কয়েকজন আদিবাসী বৃদ্ধের দেখা মিলল। বেশ আয়েশ করে চা খাচ্ছে তারা। চায়ের সাথে চলছে নানা গল্প-গুজব। ভেঙে ভেঙে বাংলা আর অপরিচিত এক ভাষায় কথা বলছে এরা। আমাদের দেখে বিনীতভঙ্গিতে বসতে দিয়ে বলল, 'জোহার' (নমশ্বকার)। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে তাদের সাথে চলে নানা আলোচনা। জানা গেল এখানে বাস করে সাঁওতাল, কড়া, ওরাও, মুণ্ডা, মাহালি আর ভুনজার সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা। বাংলা বলতে পারলেও জাতিভেদে আদিবাসীরা নিজেদের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাষায় কথা বলে। এক সম্প্রদায়ের ভাষার সাথে অন্য সম্প্রদায়ের ভাষা খানিকটা মিলে গেলেও অধিকাংশ ভাষাই ভিন্ন।

চার বছরের উপেল কড়া চা খেতে এসেছে দাদার সঙ্গে। নাম জানতে চাইলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। পাশ থেকে কৃষ্ণ 'কড়া' ভাষায় বলে, 'তোর নাম কয়েন লাগলো।' নিজের ভাষায় কথাগুলো বুঝতে পেরে

বাচ্চাটি তার নাম জানালো। পাশে বসা ওরাও সম্প্রদায়ের নিপেন টিগ্গা বাক্যটিকে তার কুরুক ভাষায় বলল, 'নিহাই নাম এন্দ্রা।' আমাদের মনে পড়ে গেল আদিবাসী চাকমাদের কথা। 'তোমার নাম কি'- বাক্যটিকে চাকমা ভাষায় বলে, 'ত নাং কি', মারমারা বলে 'না নামে জালে', গারো ভাষায়, 'নাংনি বিমুং মাই' আর রাখাইনরা বলে, 'মা নামে জালে'।

চায়ের নেশা কাটিয়ে আমরা ঢুকে পড়ি রাস্তার পাশের সাঁওতাল পাড়ায়। পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই এখানকার আদিবাসীরা বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে তীর-ধনুক নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বের হয় সীমান্তবর্তী গহীন শালবনে। বনে ঢোকার আগে এরা শিকারি ভূত বা জঙ্গল দেবতা বা দানো ভূতকে পূজা করে। এদের বিশ্বাস এতে অধিক শিকার পাওয়াসহ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। শিকারের সময়টাতে আদিবাসী গ্রামগুলোতে চলে খ্যামটা বা ঝুমের নাচ। রাতভর চলে হাঁড়িয়া খাওয়া। কথার ফাঁকে প্রিয় শিকারগুলোর নাম জানতে চাইলে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সানজিলা হর্ হর্ করে বলতে থাকে নামগুলো: মুসা (ইঁদুর), কুলাই (খরগোশ), সগট (খাটাস), বিজু (বেজি), ঘুঘু ও মায়না (ময়না)।

প্রায় সকল আদিবাসীর পছন্দের শিকার একই হলেও শুধু ভাষার



সাঁওতালদের ক্ষ্যামটা নাচের দল

ভিন্নতার কারণে এদের শিকারগুলোর নামও ভিন্ন। যেমন মুণ্ডারা খরগোশকে তাদের ভাষায় বলে 'লাম্ভা', ওরাওরা বলে 'খেড়া' আর মাহালিরা 'কুলেই'। একইভাবে আদিবাসী ভুনজাররা ইঁদুরকে বলে 'মুসো'। আদিবাসীদের খুবই প্রিয় খাবার শামুক। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাষায় এটি 'ঘুংঘি' হলেও ভুনজারদের ভাষায় এটি 'গোঙ্গা'।

সাঁওতাল গোত্রের মহত দালু সরেন বলেন অন্য আদিবাসীদের মতো তারাও তাদের জাতির ভাষা শিখেছেন শিশু বয়সে পরিবার ও গোত্রের সদস্যদের কাছ থেকে। আদিবাসী ভাষায় মায়ের ঘুম পাড়ানি গান আর বাবার আদরের ভাষা শুনতে শুনতেই তারা তা রপ্ত করে ফেলে। লিখিত কোনো বর্ণ না থাকলেও যুগ যুগ ধরে এভাবেই মৌখিক ভাষায় তৈরি হয়েছে আদিবাসী গল্প, গান, গীত, ছড়া আর নানা রূপকথা। আর আদিবাসীদের কাছে এখনো তা রয়েছে জীবন্ত। সাঁওতালপাড়ার পাশেই কড়া সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের বাস। সে গোত্রের সুনিয়া 'কড়া' ভাষায় গুন গুন করে গাইতে থাকে ঘুম পাড়ানির গান— 'নিন্না নিন্নারে নুনু, মায়ে গেল সুইহা বোচল, দাদী কান্দা বুলো হে, বাপ গাড়ি মান' (ছোটবাবু ঘুমিয়ে পড়, তোমার মা গেছে সুই বেঁচতে, দাদী কাঁদছে আর বাবা গেছে গাড়ি চালাতে)।

ক্রমেই আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা তাদের ভাষার নানা শব্দে আসর জমিয়ে তোলে। আদিবাসীরা খালাকে 'মুসি' বললেও খালুকে ডাকে 'মোসা' বলে। মাকে মুণ্ডারা 'মায়ে', মাহালিরা 'মাই', ওরাওরা 'ইয়ো' আর কড়ারা বলে 'মেয়া'। একইভাবে বাবাকে ডাকে বাপ, বা বাপা বা 'বা' বলে। ক্রমেই আমরা মজার মজার শব্দ আবিষ্কারে বিভোর হতে থাকি। গ্রামকে মুণ্ডারা বলে 'গাও', ওরারা 'পাদ্দা', কড়ারা 'গা' আর মাহালিরা 'আতো'। প্রায় সকল আদিবাসী চামচকে বলে 'কালসুর'। ধানকে আদিবাসীরা ধন বা ধান বললেও ওরাওরা ভাষায় বলে 'খেস্‌স'। আবার ডিমকে মুণ্ডারা 'আড়া', ওরাওরা 'বি' এবং কড়া সম্পদায়ের আদিবাসীরা বলে 'ডিমা'। মাছকে অধিকাংশরা 'মাছড়ি' বললেও ওরাওদের কাছে এটি 'ইনজো'। নদীকে অন্যরা 'নাদি' বা 'নেদি' বললেও মাহালিরা বলে 'গাড়া'। একইভাবে গরুকে গরু বললেও ওরাও সম্প্রদায়ের কাছে সেটি 'আড্ডো'। চাঁদ ও সূর্য আদিবাসীদের দেবতা।

এদের নিয়ে রয়েছে নানা কল্পকাহিনী। চাঁদকে সাঁওতালি ভাষায় বলে 'ইন্দাচান্দু', মুণ্ডা ভাষায় 'চান্দ', ওরাও ভাষায় 'চান্দু' আর কড়া ভাষায় 'চান'। একইভাবে সূর্যকে সাঁওতালরা বলে 'নিং চান্দু', মুণ্ডারা 'বেলা', ওরাওরা 'বিড়ি' আর কড়া ভাষায় বলে 'বেড়া'। মানুষকে মুণ্ডা ও কড়া ভাষায় 'আদমি', সাঁওতালি ভাষায় 'হড়', ওরাও ভাষায় 'আলায়' বলে। আদিবাসী ভাষার বিশাল শব্দভাণ্ডার ফেলে দালু সরেনকে নিয়ে আমরা ফিরে আসি বহবলদিঘির রাস্তায়।

জানা গেল 'বহবল' নামক একটি দিঘির নামেই গোটা গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছে। দিঘি দেখতে খানিক এগুতেই একদল আদিবাসী ছেলেমেয়ের হট্টগোল চোখে পড়ল। সবার পরনে স্কুল ড্রেস। ভয়ে ভয়ে নাম জানালো সুদেব পাহান, বিপাশা বাছকি, নির্মল হেমব্রন আর কল্পনা সরেন। সবাই ফিরছে প্রাক সমাপনী পরীক্ষা দিয়ে। ভাষা নিয়ে সুদেব পাহানের সাথে কথা বলে ব্যথিত ও লজ্জিত হই। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে যখন সে ভর্তি হয় তখন নিজের মাতৃভাষা মুণ্ডা ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা সে জানত না। নিজের মাতৃভাষায় পড়তে না পেরে সুদেবের শিশু মনে দাগ কাটে। সুদেব জানায় তার স্কুলে কোনো আদিবাসী শিক্ষক না থাকায় ভালোভাবে বাংলা ভাষা বুঝতে, পড়তে ও লিখতে তার প্রায় বছরখানেক লেগেছিল। নিজের মাতৃভাষা ছেড়ে অন্য ভাষা শেখার ভীতিতে বহুদিন সুদেব স্কুল পালিয়ে পাশের শালবনে লুকিয়ে ছিল। সুদেবের কথার পিঠে কথা বলার মানসিক শক্তি আমাদের ছিল না। তার কাহিনী শুনে মনের মধ্যে শুধু ঘোরপাক খাচ্ছিল ভাষা আন্দোলনের কথা।

ভাষাগত বৈচিত্র্যের কারণ নিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে নানা ধারণা প্রচলিত আছে। তারা মনে করে মানবসন্তানের জন্ম শুধু পৃথিবীর একটি অংশে হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানে জন্ম ও বেড়ে ওঠার কারণেই মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে নানা প্রকাশভঙ্গির। আর এই প্রকাশভঙ্গিই পরবর্তীতে ভাষায় রূপান্তরিত হয়। সাঁওতালি দালু সরেনের বিশ্বাসও প্রায় একই। আদিকালে মানুষ একটি স্থানে দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করেনি, খাদ্য সংগ্রহ, শিকার আর চাষাবাদের জন্য মানুষ দল বেঁধে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াতো। আর তখন এই দলগুলোর সদস্যদের মধ্যে নানা প্রয়োজনে তৈরি হতো এক রকমের প্রকাশভঙ্গির, এক ধরনের

ভাষার। এভাবেই সম্প্রদায়ভেদে আদিবাসীদের নানা ভাষার উদ্ভব ঘটে। সাঁওতালি ভাষার কোনো লিখিত বর্ণমালা না থাকলেও এ ভাষাকে লিখিত রূপ দেয়া, অভিধান তৈরি করা, পুস্তক রচনা ও লোককাহিনী সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে খ্রিস্টান মিশন দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালি ভাষার ওপর 'অলচিকি' নামক বর্ণমালাও তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তার তেমন প্রসার ঘটেনি।

দিঘির কাছে এসে দেখা মিলল মধ্যবয়সী আব্রাহাম হাজদার সঙ্গে। শিক্ষিত এ যুবকটি মাহালি সম্প্রদায়ের মহত। নিজের জাতির ভাষা নিয়ে জানায় নানান তথ্য। ভাষাগত দিক থেকে মাহালি আদিবাসীরা অস্ট্রিক ভাষার অনুসারী। বলা হয় অস্ট্রিক ভাষাই বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেছে। এ ভাষার অসংখ্য শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতে মুণ্ডারি ভাষাকে এই ভাষার প্রধান শাখা হিসেবে ধরা হয়, যা দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, কোরওয়া, জুয়াং, কোরবু প্রভৃতি সম্প্রদায় ব্যবহার করে। মাহালি ভাষার লিখিত কোনো বর্ণ না থাকলেও ইদানীং কিছু প্রতিষ্ঠান মাহালি ভাষা লিখার নিয়ম উদ্ভাবন করেছে। সে হিসেবে মাহালি ভাষায় ৪০টি বর্ণ রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি স্বরবর্ণ ও ৩৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ। কিন্তু বাস্তবে মাহালিদের ভাষার সঙ্গে তা পুরোপুরি মিলে না।

ভাবের বাহন ভাষা। ভাষাকে ধরে রাখার জন্য বর্ণের আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু এখনো আদিবাসীদের ভাষাগুলো বর্ণময়তা পায়নি। বরং অন্যান্য ভাষার আগ্রাসনে হারিয়ে যাচ্ছে আদি ভাষাগুলো। আদিবাসী গ্রাম থেকে যখন ফিরছি তখন চারদিকে নিঝুম অন্ধকার। আকাশে অজস্র তারার মেলা। হঠাৎ চোখের সামনেই নিঃশব্দে একটি তারা খসে পড়ল। দূর থেকে ভেসে আসতে থাকলো অজানা সব আদিবাসীর আর্তচিৎকার।

সাপ্তাহিক, ৩ জুন ২০১০



সাঁওতাল সর্দার পাঁড়ু রাজার বিদ্রোহ

সাঁওতাল সর্দার পাঁড়ু রাজার বাড়ি নাকি গিরিডোবা গ্রামে! এ গ্রামেই হয়েছিল পাঁড়ু রাজার বিদ্রোহ। সাঁওতাল বিদ্রোহেরও পূর্বের ঘটনা এটি। ইতিহাসে প্রায় উপেক্ষিত পাঁড়ু রাজার সংগ্রামের কাহিনী শুনে আমরা উদ্দীপ্ত হই। এক দুপুরে দিনাজপুর থেকে রওনা হই গিরিডোবা গ্রামের দিকে।

দিনাজপুরের বিরল উপজেলার রানীপুকুর ইউনিয়নে গিরিডোবা গ্রাম। গিরিডোবাসহ রানীপুকুরের আশেপাশের গ্রামগুলোতে মূলত নানা আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস। এখানে ছোট ছোট পাড়া করে দলবেঁধে বাস করছে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাও, কড়া, ভুনজারসহ নানা সম্প্রদায়। তবে গিরিডোবা গ্রামটিতে পূর্ব থেকেই সাঁওতালদের আধিক্যই বেশি।

গিরিডোবা গ্রামে ঢুকতেই সত্তর উর্ধ্ব এক বৃদ্ধের দেখা মিলে। প্রচণ্ড শীতে জড়োসড়ো সে। রোদের সন্ধানে রাস্তার পাশে মাটির দেয়ালে আয়েশ করে বসে আছে সে। তার চোখের চাহনি যেন অন্য কোনো কথা বলছে। নাম জানতে চাইলে আনমনা দৃষ্টিতে নাম জানায়।

নাম তার রাগদা হেমব্রম। আমাদের কথার শব্দে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে রাগদার ছেলের বউ দুলালি মার্ডি। ভক্তি নিয়ে বলে 'জোহার' (নমস্কার)। দুলালি জানালো রাগদা নাকি জন্মান্ধ। শুনে আমরা খানিকটা স্থির হয়ে যাই।

কথার ফাঁকে কথা চলে আমাদের। দুলালির আহ্বানে রাগদাকে নিয়ে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করি আমরা। চারপাশ মাটি দিয়ে ঘেরা আর ওপরে ছনেঢাকা বেশ কয়েকটি ঘর এ বাড়িতে। কিন্তু কোনো জানালার দেখা মিলল না। সাঁওতালদের ঘরগুলো নাকি এরকমই হয়ে থাকে। রাগদা থেকে জানা যায় সাঁওতালি ভাষায় এরা দেবতাকে 'বোঙ্গা' বলে। এদের বিশ্বাসে বোঙ্গার সংখ্যা অসংখ্য। এরা মনে করে দৈত্য-দানব প্রেতাত্মাদের

মতো দুষ্ট বোঙ্গারাও সব সময় তাদের অনিষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। দুষ্ট বোঙ্গারা নাকি রাত্রিবেলায় তাদের ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখে। আর এতে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে। তাই সাবধান থাকতে হয় বোঙ্গারা যেন তাদের দিকে কোনো কুনজর দিতে না পারে। সে কারণেই সাঁওতালরা তাদের শোয়ার ঘরে কোনো জানালা রাখে না বা রাখলেও বেশ উঁচুতে রাখে।

আমরা নিবিষ্ট মনে রাগদার কথা শুনছিলাম। তার বাড়ি থেকে বের হয়ে পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে থাকি। গন্তব্য পাঁড়ু রাজার বাড়ি। আগ্রহের সাথে আমাদের পথ দেখিয়ে নেয় দুলালি।

কয়েকটি বাড়ি পার হয়ে একটি জায়গায় এসে আমরা থমকে দাঁড়াই। রাস্তার পাশেই উঁচু করে তৈরি করা হয়েছে চারকোণা একটি জায়গা। উপরে টিনের সেড। কিছু বোঝার আগেই দুলালি জানায় এটি 'জাহের' বা 'মাঝির থান'। আদিবাসীদের নিয়মিত পূজার স্থান।

জাহের এর স্থান নির্বাচন ও সেখানে কল্পিত দেবতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত আছে প্রাচীন এক পদ্ধতি। দুলালি আপন রীতিতে বলতে থাকে পদ্ধতিটি।

যখন নতুন গ্রামে সাঁওতালরা বসবাস শুরু করে তখন ঐ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'জাহের' বা 'মাঝির মন্দির'। এর জায়গা নির্বাচনের জন্য চারজন ভালো লোককে মনোনীত করা হয়। তারা গ্রামের মাঝি বা মণ্ডলের বাড়িতে সমবেত হয়। মাঝি তাদের পা ধোয়ার পানি দেয়। তারা কিছু পানি দিয়ে পা ধুয়ে বাকিটা মাথায় দেয়। অতঃপর চারটা কুলাতে চারজনকে কিছু চাল দেয়া হয়। ডান হাত দিয়ে তারা বসে বসে চাল ঘষতে থাকে। এ সময় মাঝি উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করতে থাকে। মন্ত্র শুনে চারজনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং তাদের সারা শরীর কাঁপতে থাকে। সাঁওতালি ভাষায় এ অবস্থাকে 'রুম' বলে। রুম অবস্থায় তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় নতুন গ্রামে কোথায় বোঙ্গা আছে? তখন তারা বাইরে গিয়ে পাথর নুড়ি কুড়িয়ে আনে এবং মাঝি, মণ্ডল ও গোসাই-এর স্ত্রী প্রমুখের নামে পাথর নুড়িগুলো মহুয়ার গাছ বা শালগাছ বা বটগাছ কিংবা মণ্ডলের বাড়ির সামনে পুঁতে ফেলে। এভাবে জাহের বা মাঝির থানের জায়গা নির্ধারণ করা হয়।

একইভাবে তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় কে পূজারীর পদ লাভ

করবে? তখন তারা যার মাথায় ঘটির পানি ঢেলে দেয় প্রথা অনুসারে সেই 'নাইকো' বা 'ঠাকুর' নিযুক্ত হয়। এভাবে নিযুক্ত ঠাকুর তখন পাথর নুড়িগুলো সাজিয়ে নতুন স্থানে গ্রাম দেবতার পূজার প্রবর্তন করেন।

গিরিডোবা গ্রামে জাহেরের পাশেই দালু সরেনের বাড়ি। গ্রামের সবচেয়ে বয়োজৈষ্ঠ্য সে। পাঁড়ু রাজার কথা জানতে চাইলে প্রথমে নীরব থাকে সে। অতঃপর বলতে থাকে। দালুর স্মৃতিতে পাঁড়ু রাজা এখনো প্রায় জীবন্ত। 'এ গ্রামের পূজার স্থান বা 'জাহের' এক সময় ছিল পাঁড়ু রাজার ভিটায়'— এভাবেই তিনি শুরু করেন। কাঁপা কাঁপা গলায় নিজ ভঙ্গিতে বলতে থাকেন পাঁড়ু রাজার বিদ্রোহের কাহিনী।

গ্রামের এক ক্ষুদে কৃষক ছিল পাঁড়ু। তার ছিল জমিজমা আর বিশাল পশুসম্পদ। পাঁড়ুর ছোট ভাইয়ের নাম 'চারু'। আশপাশের সাঁওতালরা পাঁড়ুকে বেশ ভক্তি করতো। সে সময় পাঁড়ুর বাড়িতেই ধুমধামের সাথে চলতো সাঁওতালদের নানা পূজা পার্বণের আনুষ্ঠানিকতা। আশপাশের গ্রামের সাঁওতালরা মনের আনন্দে যোগ দিত সেসব অনুষ্ঠানে। এসব কারণে স্থানীয় সাঁওতালরা পাঁড়ুকে মানতো রাজা হিসেবে। আর এভাবেই সাঁওতাল সর্দার পাঁড়ু হয়ে যায় 'পাঁড়ু রাজা'।



পাঁড়ু রাজার নাতি জাগনা মার্ডি

নাচোল বিদ্রোহের দেড় দশক পূর্বের ঘটনা এটি। নিজের জমির কর ব্রিটিশদের দেয়া নিয়ে পাঁড়ুর মধ্যে বিদ্রোহ জেগে ওঠে। সে সময় পাঁড়ু ব্রিটিশ আনুগত্য অস্বীকার করে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দেয়। তার নির্দেশে আশপাশের কয়েক হাজার সাঁওতালও রাজস্ব না দিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিস্ময়কর বিদ্রোহ করতে থাকে। বিদ্রোহীদের থামাতে এগিয়ে আসে স্থানীয় দারোগা-পুলিশ। কিন্তু সাঁওতালদের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড দেখে বাধা দেয়া তো দূরের কথা নিজেকে বাঁচাতে তারা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়।

ক্রমেই পাঁড়ু রাজার বিদ্রোহের ঘটনাটি জেলা প্রশাসন হয়ে কলকাতার লাট সাহেবের দরবার পর্যন্ত পৌছায়। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে ব্রিটিশ লাট। সৈন্য পাঠিয়ে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে উড়িয়ে দেয় পাঁড়ু রাজার ভিটাবাড়ি। বন্দী করা হয় সাঁওতাল সর্দার পাঁড়ুসহ অন্যান্য বিদ্রোহীদের।

ইতিহাস মতে, নাচোল বিদ্রোহের পূর্বে পাঁড়ু রাজার বিদ্রোহটি ছিল একটি দুর্দান্ত সাঁওতাল অভ্যুত্থান। অবশেষে পাঁড়ু রাজার কি পরিণতি হয়েছিল ইতিহাসে তা পাওয়া যায়নি। পাঁড়ুর বিদ্রোহের গল্প শেষে ইতিহাসের নির্মম সত্য জানতে আমরাও এগোতে থাকি তার ভিটার দিকে।

কয়েকটি বাড়ি পার হয়ে দুলালি দেখিয়ে দেয় মাটির দেয়ালঘেরা একটি ছিমছাম বাড়ি। কিন্তু খেয়াল করেও বাড়ির আশেপাশে কোনো বোঙ্গার দেখা মিলল না। দরজার কড়া নাড়তেই যুবক বয়সী এক ছেলের দেখা। বাড়ির ভিতরে নিয়ে আমাদের সে বসতে দেয়। বাড়ির এক কোণায় গরুকে খাওয়ানোয় ব্যস্ত লক্ষী মুরমু। জানা গেল লক্ষী মুরমু পাঁড়ু রাজার বেঁচে থাকা একমাত্র নাতি জাগনা মার্ডির স্ত্রী। পাঁড়ু রাজার কথা জানতে চাইলে সবাই অবাক হয়। মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

পাঁড়ু রাজার ছিল এক ছেলে। নাম ছিল তার 'দুবায় মার্ডি'। আবার দুবায় মার্ডির ছিল দুটি ছেলে। তার মধ্যে যাগতু মার্ডি মারা যাওয়ায় জাগনা মার্ডিই বর্তমানে পাঁড়ু রাজার বেঁচে থাকা একমাত্র বংশধর।

গল্পের আসর জমে ওঠার আগেই বাড়িতে প্রবেশ করে জাগনা মার্ডি। বয়স আনুমানিক ৭০ বছর। পাঁড়ুর কোনো স্মৃতিচিহ্নের খোঁজ নেই তাদের কাছে। পাঁড়ুর বিদ্রোহের ইতিহাস তাদের কাছে গল্পমাত্র। সময়ের আবর্তে পাঁড়ু রাজার সংগ্রামের ইতিহাসটির মৃত্যু ঘটেছে তারই বংশধরদের কাছে।

সাঁওতাল সরদার পাঁড়ু রাজা এক সময় সাম্রাজ্যবাদ, শোষণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু আজ তার বংশধররাই নানা সুবিধা লাভের প্রলোভনে নিজের জাতিসত্তাকে বির্সজন দিয়ে গ্রহণ করেছে খ্রিস্টান ধর্ম। ফলে পাঁড়ুর ভিটায় আজ আর ঢাক, ঢোল আর মন্দিরা বাজে না। সাঁওতালি নৃত্যের উল্লাসে হয় না কোনো পূজার আনুষ্ঠানিকতা। পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস আর ঐতিহ্যের 'বোঙ্গা' পাঁড়ুর হাল আমলের বংশধরদের কাছে শুধুই কুসংস্কার।

সংগ্রামী পাঁড়ু রাজার ভিটা থেকে বের হই মলিনমুখে। একজন সংগ্রামীকে স্মরণ করে অন্যরকম কষ্ট অনুভব করি আমরা। ফেরার পথে দেখা হয় পাঁড়ুর ভাই চারুর নাতি জাকব মার্ডির সঙ্গে। সে জানালো পাঁড়ু রাজার শেষ পরিণতির কথা।

বন্দী হওয়ার পর পাঁড়ুর সকল জায়গা-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশ লাট। এক সময় পাঁড়ুকে ছেড়েও দেয়া হয়। কিন্তু সংগ্রামী এই সাঁওতাল সর্দারকে মৃত্যুবরণ করতে হয় নির্মমভাবে। পূর্ব শত্রুতার কারণে স্থানীয় হাকিম সর্দার নির্জন রাস্তায় পাঁড়ুকে একা পেয়ে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। পাঁড়ু রাজার মৃত্যুর পর নিস্তব্ধ হয়ে যায় গিরিডোবাসহ আশপাশের আদিবাসী গ্রামগুলো। সময়ের স্রোতে ইতিহাসের পাতা থেকে এভাবেই ম্লান হয়ে যায় পাঁড়ুর মতো বিদ্রোহী সৈনিকের নাম।

সাপ্তাহিক, ৬ মে ২০১০

লোহাডাংগার আদিবাসী তুরিদের কথা

শহর থেকে আসা বাসগুলো মুল্লুক দেওয়ানের কাছে এসেই থেমে যায়। বাসের ভিতর থেকে যাত্রীরা কবরের দিকে ছুঁড়ে দেয় মানতের পয়সা। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে মাজারের নীরবতা ভাঙে। পাকা রাস্তার একপাশে মুল্লুক দেওয়ান আর অন্যপাশে তার বজরার মাঝির কবর। বিষ্ণপুরবাসীর বিশ্বাসে মুল্লুক দেওয়ান সত্যপীর।

দানের পয়সা আর সরকারি অর্থে মুল্লুক দেওয়ানে তৈরি হয়েছে একটি এতিমখানা। এতিমখানার পাশেই বেশ পুরনো একটি পুকুর। পুকুরপাড়ে বাবরি দোলানো সারি সারি লিচু গাছ। চারদিকে গা ছমছমে পরিবেশ। ভোর হতে না হতে বাতাসে ভেসে বেড়ায় কোমলমতি বাচ্চাদের কণ্ঠে তেলওয়াতের সূর।

মাঝে মাঝে কোনো বিপদগ্রস্ত জনকে নীরবে চোখের পানি ফেলতে দেখা যায় মুল্লুক দেওয়ানে। মোমবাতি আর গোলাপজল ছিটায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও। বিষ্ণপুর গ্রামের লোকেদের বিশ্বাস, 'মুল্লুক দেওয়ান কাউকে খালি হাতে ফেরায় না।' এরকম নানা বিশ্বাসের গল্প নিয়ে যুগ যুগ ধরে মুল্লুক দেওয়ান বেঁচে আছে বিষ্ণপুরবাসীর মনে।

মুল্লুক দেওয়ানের অপর পাশেই লোহাডাংগা। সেখানে বাস করে আরেক বিশ্বাসের মানুষেরা। যাদের মনে মুল্লুক দেওয়ান নেই। আছে বিষহরি, কারমা, জিতিয়া, মশান কালি, শশ্মান কালির মতো দেবতারা। গ্রামের সকলের কাছে এরা শিং সম্প্রদায়। কিন্তু আসলে এরা 'তুরি'। নিয়ম মেনে এরা পূরুষদের নামের শেষে 'শিং' আর মেয়েদের নামের শেষে 'বালা' বা 'দেবী' টাইটেল ব্যবহার করে।

তুরিদের খোঁজ পেয়ে আমরাও রওনা হই বিষ্ণপুর গ্রামের লোহাডাংগার দিকে। দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় এ গ্রামটি।

পাকা রাস্তার দুদিকে মাটি আর ছনের তৈরি বেশ কয়েকটি বাড়ি। দুপুরের পর বাড়িগুলো যেন পুরুষশূন্য। বাড়ির ভিতরে বেশ আয়েস করে আড্ডা দিচ্ছে মহিলারা। নিজেদের মধ্যে তারা কথা বলছে বাংলা মেশানো অচেনা এক ভাষায়। এটি আবার কোন ভাষা? উত্তরে মিলে মুচকি হাসি। পাশ থেকে বাসন্তি বালা উত্তর দেয়, 'হামে তুরি জাতি, হামারা ভাষা তুরি'।

মহিলাদের পিছনে ফেলে আমরা গ্রামটির ভিতরে ঢুকে পরি। প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি বাড়ি এখানে। একটি বাড়ির কাছে এসেই আমরা থমকে দাঁড়াই। ভিতরে দরদ দিয়ে বিষহরির গান গাইছে কয়েকজন।

'সাইয়া পাড়া লোক দুর্গা
মোর বাজে গাইয়ো গো
সাদ গুরু বান্দা মাইগে
জয়া বিষহরি,

ভিতরে ঢুকতেই গান থামিয়ে দেয় সবাই। একটি ঠুল টেনে বিনীত ভঙ্গিতে গোত্রের মহত লবানু শিং আমাদের বসতে দেয়। বাড়ির ভিতর মাটি উঁচু করে তৈরি করা হয়েছে ছোট্ট একটি জায়গা। পাশেই সন্ধ্যাতারা ফুলের একটি গাছ। লবানু জানায় এটি তাদের 'তুলসি থান' বা 'প্রার্থনার স্থান'।



তুরি সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা

তুলসি গাছ না থাকলেও যে কোনো একটি ফুলের গাছ সেখানে লাগাতে হয়। এটাই আদিবাসী তুরিদের রীতি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ির মহিলা কিংবা বউরা সন্ধ্যাপ্রদীপ দেয় এখানে। সন্ধ্যা হলেই শাশুড়ী বাড়ির বউদের খোঁজ করে। তুরি ভাষায় বলে, 'বউয়ে, তুলসি থানোন সানবাতি দে, ধুম জ্বালায়ে দে।'

লবানু জানায় তাদের পূর্বপুরুষদের কথা। আদিবাসী তুরিরা এখানে বাস করছে ব্রিটিশ আমলেরও পূর্ব থেকে। এসেছে ভারতের ভাগলপুর থেকে। এক সময় এখানে ছিল আদিবাসী তুরিদেরই ৪টি গ্রাম। কালের আবর্তে নানা কারণে এখন টিকে আছে শুধু একটি পাড়া।

কৃষিকাজ তুরিদের প্রধান পেশা। কিন্তু স্বাধীনের পর হতে আদিবাসী তুরিদের বাপ-দাদার আমলের জমিগুলো বেদখল হতে থাকে। এখন অধিকাংশ জমিই স্থানীয় ভূমিদস্যুদের দখলে। ফলে এখন তুরিরা অন্যের জমিতে চাষাবাদের পাশাপাশি অনেকেই নাউয়া গিরি (নাপিতের কাজ) করছে।

আদিবাসী তুরিদের গোত্র পরিচালনায় থাকে ৪ সদস্যের পরিষদ। লবানু শিং একে একে বলতে থাকে পদের নামগুলো মণ্ডল, মহত, বাসি, ছড়িদার। গোত্রের মণ্ডল মোহনা শিং মারা যাওয়ায় মহত লবানুই মহতের কাজ করছে। লবানু ছাড়া এখন পরিষদের কেউই আর বেঁচে নেই। বাসি পদের ছোট্ট শিং আর ছড়িদার পদের পাতলা শিংয়ের মৃত্যুর পর এখানকার আদিবাসী তুরিরা তাদের পরিষদকে আর পূনর্গঠিত করেনি। গোত্রের রাসেন শিংয়ের মতে তুরিদের কাছে মণ্ডল বা মহত ছাড়া এখন আর অন্য পদগুলোর কার্যকারিতা নেই। সময়ের সাথে সাথে ভেঙে পড়েছে আদিবাসী তুরি সম্প্রদায়ের সমাজ কাঠামো।

গোত্রের মণ্ডল মোহনা শিংয়ের মৃত্যুর পর এখানকার তুরিরা পালন করে নানা আচার। সে কথাগুলোই বলতে থাকে লবানু। আদিবাসী তুরি সম্প্রদায়ের কারো মৃত্যু হলে তাকে গোসল করিয়ে সাদা কাপড় পরিয়ে কবর দেয়া হয়। বাড়ি থেকে লাশ নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটি মাটির হাড়িতে গোবর গুলিয়ে নেয় তুরিরা। অতঃপর গোটা পাড়ার বাড়িগুলোতে ছিটিয়ে দেয়া হয়। গোবর শেষ হলেই হাঁড়িটিকে নিয়মমাফিক বাড়ির মধ্যেই ভেঙে ফেলতে হয়।

অন্য আদিবাসীদের মতো তুরিদের মৃত্যুর পর ৭ দিন পর্যন্ত এরা তরকারিতে হলুদ খেতে পারে না। ১৩ দিনের দিন এরা বাড়িতে নাপিত

ডেকে এনে সবার চুল ও দাড়ি কামিয়ে দেয় এবং মহিলাদের কানি আঙ্গুলে নখ হালকাভাবে ঘষে দেয়। এদের বিশ্বাস এতে এদের শুদ্ধি ঘটে। এরপর চলে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব। তুরিদের ভাষায় এটি 'ক্রিড়িয়া'।

লবানু শিংয়ের সাথে কথা বলতে বলতেই সেখানে তুরি সম্প্রদায়ের অন্যদের ভিড় জমে যায়। পরিচয় দিতে গিয়ে কথা হয় খিড়ো বালা, বিজলী বালা আর দুলালী বালার সাথে। তাদের থেকে জানা যায় তুরিদের সবচেয়ে বড় উৎসব কারমা পূজার কথা। মূলত এটি গাছের পূজা। আদিবাসী কড়াদের মতোই বন থেকে কেটে আনা বিরল প্রজাতির খিল কদম গাছের পূজা করে এরা।

ভাদ্র মাসে হয় করমা পূজাটি। পূজার পূর্বে মেয়েদেরকে তার স্বামীর বাড়ি থেকে দাওয়াত করে নিয়ে আসে তার ভাই ও বাবা। তাই ভাদ্র মাসে চারদিকে যখন কাশ ফুল ফুটতে থাকে তখন মেয়েদের মনে বাবার বাড়ি যাওয়ার আনন্দের ঢেউ লাগে। মনের এই আকুতি নিয়ে করমা পূজার সময় দলবেঁধে তারা গায় নানা গান।

আমাদের শোনাতে খিড়ো বালা সুর করে গাইতে থাকে—

'কাশি ফুলা ফুটেই গেলে
আসা মরা লাগি গেলে
ভাইয়া বাপা লেগেল আতে বেটিক
কারমা পূজাকে রাতে।'



পাশ থেকে বিজলী বালা ধরেন আরেকটি গান—

'করম ডাল, করম ডাল
চল শ্বশুরায়ে
ভাদ্র মাসে বিয়া হতে গো
আনে ঘুরায়ে।'

আদিবাসী তুরিদের কণ্ঠে আমরা গান শুনছিলাম একমনে। হঠাৎ পাশের বাড়িতে একটি লোকের আর্তচিৎকার। আমরা প্রায় দৌড়ে চলে গেলাম মহতের পাশের বাড়িটিতে। সেখানে সাপে কাটা এক রোগীর শরীর থেকে বিষ নামাচ্ছিল মহতেরই ভাই সবানু সিং। বিশেষ ভঙ্গিতে পড়ছেন তুরি ভাষায় মন্ত্র—

'এখানি পুসকেননি চারি খানি ঘাট
তাতে দিনু পদ্মার পাত

পদং কুমারী মা-বাপার নাম— জয় বিষহরি
নাব বিষ নাব
বত্রিশে গড়ে গড়ে নাব
নিচ থাকি উপারে যদি ধাউবো
দোহার লাগে— শিব, দুর্গা, কার্তিক, গনেশের মাথা খাবো।'

কারমা পূজা ছাড়াও তুরিরা বিষহরি পূজা করে ধুমধামের সাথে। পূজার সময় সারা বছর সাপে কাটা রোগীদের কাছ থেকে হাঁস সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর হাঁসগুলোকে বিষহরির সন্তুষ্টি লাভের জন্য বলি দেয়া হয়। হাঁস কেন? এরকম প্রশ্নে সবানু মুচকি হাসে। উত্তরে বলে, 'হাসো পর বিষহরি বেটলেছে'। তুরিদের বিশ্বাস বিষহরি বা মনসা দেবী হাঁস পছন্দ করে। তাই হাঁসের মাথায় বিষহরি বসে থাকে।

সবানু জানায় বিষহরির পূজা হয় পহেলা ভাদ্রে। পূজার পরের দিন এ গ্রামে আদিবাসী তুরিরা 'তুমরি খেলা'র আয়োজন করে। এ খেলায় মাঠের মধ্যে একটি সাপ ছেড়ে দেয়া হয়। সাপ ছাড়ার পর দুজন মন্ত্র পাঠ করতে থাকে। যার মন্ত্রে সাপ দ্রুত চলে আসে এবং বশ্যতাস্বীকার করে তাকেই জয়ী ধরা হয়।

লোহাডাংগার আশেপাশের গ্রামগুলোর আদিবাসীদের অধিকাংশই অভাবের কারণে সুবিধা লাভের আশায় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। তুরিদের কাছেও নানা সময়ে এসেছে ধর্মান্তরিত হওয়ার নানা প্রলোভন। নানা অভাব অনটনের মধ্যেও সেসব প্রলোভনে পূর্বপুরুষদের জাত বিক্রি করতে রাজি নয় আদিবাসী তুরিরা। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছেন না কেন? এ রকম প্রশ্নে খিড়ো বালা ক্ষেপে যায়। চিৎকার করে তুরি ভাষায় বলতে থাকে— 'হামিরি ধর্ম হামে চেলবে, তরনিক ধর্ম লিয়ে হামে নে চলবে, হামে খাটিয়ে খাবে, জাতি নে মারবে।'

অন্য রকম শ্রদ্ধা নিয়ে আমরা তাকিয়ে থাকি ক্ষিপ্ত ও প্রতিবাদি খিড়ো বালার দিকে। মনে মনে বলতে থাকি স্বজাতীয় চেতনা নিয়ে যুগে যুগে বেঁচে থাকুক আদিবাসী তুরিরা।

সাপ্তাহিক, ১৩ মে ২০১০



হুল হুল কেন বলে সিধু!

স্কুল মাঠের এক কোণায় ছোট্ট একটি শহীদ মিনার। চুনকাম আর ধুয়েমুছে সাজানো হয়েছে শহীদ মিনারটিকে। দড়ির মধ্যে লাল, নীল, বেগুনি নানা রঙের কাগজ জড়িয়ে তা দিয়ে সাজানো হয়েছে গোটা মাঠটিকে। কোনো জাতীয় দিবস নয়, তবু কেন এত আয়োজন? স্কুলশিক্ষক সানজিলা হাজদা জানালো, প্রতি বছর ৩০ জুন তারিখটি তাঁদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারাদেশের মতো মহেশপুরেও এইদিনে তাঁরা উদ্‌যাপন করে সিধু (সিধো)-কানু (কানহো) দিবসটি। আর আজ সে কারণেই এতো আয়োজন।

দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলা থেকে নিদেনপক্ষে দশ কিলো ভিতরে মহেশপুর গ্রামটি। গ্রামের প্রধান রাস্তার দু'ধারের বাড়িগুলো খানিকটা অন্যরকম, অন্য ঢঙের। লোকসকল একে অপরের সাথে কথা বলছে ভিন্ন কোনো ভাষায়।

মহেশপুর মূলত সাঁওতালদের একটি গ্রাম। আদিবাসী সাঁওতালরা এখানে বাস করছে বহুপূর্ব থেকেই। শোনা যায় এই মহেশপুরেও হয়েছিল সাঁওতালদের বিদ্রোহ। আর সে সময়ে এখানকার সাঁওতালরাই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল বিদ্রোহে।

শহীদ মিনারের গায়ে খোদাই করে লেখা চারটি নামের দিকে আমাদের চোখ পড়ে। সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরব। আদিবাসী সাঁওতালদের সংগ্রামী চেতনার সাথে মিশে থাকা চারটি নাম। রাস্তার পাশে চা খেতে খেতে ভাঙা ভাঙা বাংলায় সানজিলা বলতে থাকে সিধু-কানুর বীরত্বের কাহিনীটি।

সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরব ছিল চার ভাই। সাঁওতাল পরগনার ভাগনাদিহি গ্রামের এক দরিদ্র সাঁওতাল পরিবারে এদের জন্ম। এক সময় এরা বেশ

সচ্ছল ছিল। একবার ফসল না হওয়ায় মহাজনদের কাছে তাদের দেনা বেড়ে যায়। ফলে ক্রমেই তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে।

সে সময় নানা অজুহাতে মহাজন আর জমিদাররা সাঁওতালদের ওপর জুলুম, নির্যাতন চালাতো। বীর সিং ও গোচ্চার অপমান ও পীড়ন দেখে সিধু-কানুর মনে দাগ কাটে।

একবার সাতকাঠিয়া (সাতখেতিয়া) গ্রামে ঢুকে মহেশ নামের এক দারোগা সাঁওতালদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। জনসম্মুখে ঐ দারোগা কয়েকজন সাঁওতালকে গাছের সাথে বেঁধে নির্দয়ভাবে চাবুক মারতে থাকে। সাঁওতালদের ওপর এরকম অত্যাচার দেখে সিধু-কানুর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

তারা তখন ভাগনাদিহি গ্রামে জমায়েত হবার জন্য চারপাশের সাঁওতালদের কাছে পাতা সমেত ছোট শালের ডাল পাঠায়। এভাবে সবাইকে ডাক দেয়ার রীতিটি ছিল সাঁওতালদের ঐতিহ্য।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন। সিধু-কানুর ডাকে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল একত্রিত হয় ভাগনাদিহি গ্রামে। সকলের সামনে সিধু-কানু তুলে ধরেন— সাঁওতাল জীবনের দুঃখের কাহিনী, ইংরেজ, জমিদার, মহাজন আর পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী, মহাজনদের নিকট সাঁওতালদের সপরিবারে দাসত্বের কাহিনী, সাঁওতালদের স্ত্রী-কন্যার ইজ্জতনাশের কাহিনী।

সিধু-কানুর বক্তব্য শুনে উপস্থিত সাঁওতালরা গর্জে ওঠে। সবাই শপথ নেয়— জমিদার মহাজনদের, ইংরেজ শাসকের, পুলিশ-পাইক-পেয়াদার, জজ ম্যাজিস্ট্রেটের নিপীড়ন ও দাসত্ব সহ্য না করার। সিদ্ধান্ত নেয় খাজনা না দেয়ার। বিদ্রোহী কণ্ঠে সবাই স্লোগান দিতে থাকে— 'জমি চাই, মুক্তি চাই।'

আমরা আগ্রহ নিয়ে শুনছিলাম সিধু-কানুর কথা। সানজিলা আবারো বলতে থাকে। বিদ্রোহের আওয়াজ সমস্ত সাঁওতাল ও অন্যান্য গরিব কৃষকদের মাতিয়ে তুলে। বিদ্রোহে সাঁওতালদের সাথে অন্যান্য আদিবাসী, বাঙালি ও বিহারি হিন্দু ও মুসলমান গরিব কৃষক ও কারিগররাও যোগ দেয়।

বিদ্রোহীরা মহেশ দারোগাসহ তাদের ওপর নির্যাতনকারী মহাজনদের একে একে হত্যা করতে থাকে। ক্রমেই বিদ্রোহ চারদিকে ছড়িয়ে পরে। বিদ্রোহীদের শক্তি দেখে জমিদার, মহাজন ও ঠকবাজ ব্যাপারিরা ঘরবাড়ি

ফেলে পালাতে থাকে। বিদ্রোহীরা ডাক ও রেল বন্ধ করে দেয়। এভাবে বিদ্রোহ বিস্তৃতি লাভ করে বীরভূম জেলা, ভাগলপুর জেলা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে।

সে সময় বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চলাফেরা করতো। তারা দ্রুত আক্রমণ করে তড়িৎ গতিতে সরে পড়তো। বিদ্রোহীদের হাতে অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক, টাঙ্গি, কুঠার ও তলোয়ার।

বিদ্রোহী দমনের জন্য বহরমপুর থেকে সৈন্যদল আসে মুর্শিদাবাদে। সেখানকার জেলা শাসক টুগুডে ১৫ জুলাই মহেশপুরে বিদ্রোহীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংর্ঘষে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয় এবং আহত হয় সিধু ও তাঁর অন্য দু'ভাই কানু ও ভৈরব।

১০ নভেম্বর সামরিক আইন জারি করে জেনারেল লয়েড ও জেনারেল বার্ড চৌদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ এলাকা ঘিরে ফেলে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত ১০ হাজার সাঁওতালকে হত্যা করে তারা বিদ্রোহ পুরোপুরি দমন করে।

নভেম্বরের শেষ ভাগে জামতাড়া এলাকা থেকে বন্দী করা হয় কানুকে। সিধু তার পূর্বেই ধরা পড়ে ঘাটিয়ারিতে। পরে তাকে ভাগনাদিহি



সিদু-কানু স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিচ্ছেন দুই আদিবাসী

গ্রামে নিয়ে হত্যা করা হয়। কানুর বিচার হয় আদালতে। বিচারের পর তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

বিদ্রোহ দমনের পর সাঁওতালদের দাবি দাওয়া ও অভিযোগ তদন্ত করে সাঁওতাল পরগনা নামে তাদের জন্য একটি পৃথক নন-রেগুলেটেড জেলা গঠন করে সরকার। সানজিলার মতে, সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহীদের সংগ্রাম সরাসরি বিজয় না আনলেও এই সংগ্রাম বাংলার ও ভারতের কৃষক সংগ্রামের ঐতিহ্যকে আরো উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করেছে।

মাদলের শব্দে আমরা আবার খেয়াল ফিরে পাই। এরই মধ্যে গোটা মাঠে জড়ো হয়েছে সাঁওতালসহ নানা সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার আদিবাসী। সিধু-কানুকে স্মরণ করে একে একে তারা ফুল দেয় শহীদ মিনারের বেদীতে। সারা দিন চলে আদিবাসী নাচ, গান, তীর-ধনুক খেলা আর স্মৃতিচারণ।

সাঁওতালরা বিশ্বাস করে তাদের সত্তায় সিধু-কানু বার বার ফিরে আসে। অন্যায়, অত্যাচার আর নানামুখী বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের রুখে দাঁড়ানোর প্রাণশক্তি সিধু-কানু। তাই আজো সাঁওতালরা দলবেঁধে গান ধরে—

'হুল (বিদ্রোহ) হুল কেনো বলে সিধু
মার মার কেনো বলে সিদু
নিজের জেদ লেগিত এত মায়া জালায়ে
হুল হুল কেনো বলে সিধু রে।'

সাপ্তাহিক, ৭ অক্টোবর ২০১০

আদিবাসী ভুনজারদের জিন্দা দেবতা

'বহবল' নামক একটি দিঘির নামেই গোটা ইউনিয়নের নামকরণ হয়েছে বহবলদিঘি। দিনাজপুরের বিরল উপজেলা হতে দূরত্ব ৬ কিলোর মতো। পাকা রাস্তার চারপাশে বড় বড় গাছ। চারপাশে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে শুধুই ধান ক্ষেত।

কৃষক ভুলানো সবুজ-সোনালী রঙের থোকা থোকা ধান ঝুলছে মাঠগুলোতে। ধান কাটার সময় আগতপ্রায়। তাই গ্রামের কৃষকদের মুখে আনন্দের গুপ্ত হাসি। একটি চায়ের দোকানে কয়েকজন বৃদ্ধের দেখা মিলল। বেশ আয়েশ করে চা খাচ্ছে তারা। চায়ের সাথে চলছে নানা গল্প-গুজব। এবার ধান কেমন হবে, দাম কত হবে, লাভ হবে কিনা— এ নিয়ে চলছে তর্কের ফুলঝুড়ি। কারো কারো মুখে আদিবাসী পাইট বা কাদর খোঁজার অস্থিরতা। কেননা ফসল তুলতে আদিবাসী পাইট (শ্রমিক)দের কোনো বিকল্প নেই। এ কারণেই ফসল কাটার সময় ঘনিয়ে আসার সাথে সাথেই স্থানীয়দের আনাগোনা শুরু হয় আদিবাসী গ্রামগুলোতে।

ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে অনাহারে ও অর্ধাহারে থাকা আদিবাসীদের কেউ খোঁজ না করলেও অগ্রহায়ণে এদের কদর বেড়ে যায়। এ সময়ে অনেককেই আবার অধিক মজুরির প্রলোভন দেখিয়ে ভাঙার চেষ্টা করে আদিবাসীদের সততাটুকু। জানা যায়, গোটা বহবলদিঘির চারপাশেই নানা আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস। গ্রামের পাশেই ঘন সবুজ শালবন। একসময় এই শালবনকে ঘিরেই চলতো আদি মানুষদের জীবন, সংস্কৃতি ও ধর্মপ্রবাহ।

নানা চিন্তার ঘোর কাটার পূর্বেই আমরা পৌঁছে গেলাম বহবলদিঘি বাজারে। বাজারের এক পাশে বড় কালিমন্দির। কালি পুজাতে এখানে শত শত পশু বলি দেয়া হয়। বাজারের অন্যপাশে রাস্তা ঘেঁষা বেশ কিছু মাটির

দেয়াল। ভিতরে বিশ পঁচিশটি বাড়ি। বাইরের দেয়াল দেখে ভিতরের বাড়িগুলোর অবস্থা অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। একটি বাড়ির দরজা ঢেলে ভিতরে ঢুকতেই তাকিয়ে থাকি খানিকক্ষণ। খড় আর মাটির তৈরি ছোট ছোট ঘর বিধ্বস্ত হয়ে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে। একইভাবে এখানে কোনো রকমে টিকে আছে একটি আদি সম্প্রদায়। একটি আদি সভ্যতা। পাশে থাকা দেবী কালির সুনজর পড়েনি এদের ওপর। মধ্যবয়সী উষার কাছে জানতে চাইলাম তাদের সম্প্রদায়ের নামটি। কিছুটা শঙ্কা আর চিন্তিত মুখে সে বলল, 'হামনি ভুনজার জাতি।'

কবে থেকে এই আদি মানুষগুলো এখানে। গোত্রের মহত বাতাসু ভুনজার তার ভাষায় বলেন, 'এ ভাঙ্গা পার খুবে জঙ্গল ছেলে, কাটি কুটি বসত কার লেসে।' মহতের সাথে নানা বিষয়ে গল্প জমে উঠতেই বাড়ির এক কোণায় ভাঙাচোরা দুটি পালকি নজরে এলো। টিন আর কাঠের তৈরি পালকি দুটি পুরনো হলেও যথেষ্ট্য যত্নসহকারে রাখা হয়েছে।

এক সময় সকল বিয়েতেই পালকির ব্যবহার ছিল। সে সময়ে পালকির প্রয়োজনে সকলকেই আসতে হতো আদিবাসী ভুনজারদের এই গ্রামটিতে। সময়ের সাথে সাথেই বদলে গেছে বিয়ের রীতিগুলো। ফলে বিয়ের আচার থেকে ক্রমেই পালকির প্রচলন উঠে যাচ্ছে। পালকি এখন রূপকথার হিমঘরে কোনো রকমে টিকিয়ে রাখছে নিজেকে। মহত জানালো এখনো শীত মৌসুমে মাঝে মাঝে কোনো বিত্তশালীর বিয়েতে ডাক পড়ে ভুনজার গ্রামের পালকি সর্দার গমেশ ভুনজারের। পালকি টানার আনন্দে গমেশ তখন নিজ ভাষায় ডাকতে থাকে অন্যদের, বলে, 'পালকি বোহেল লাগতে'।

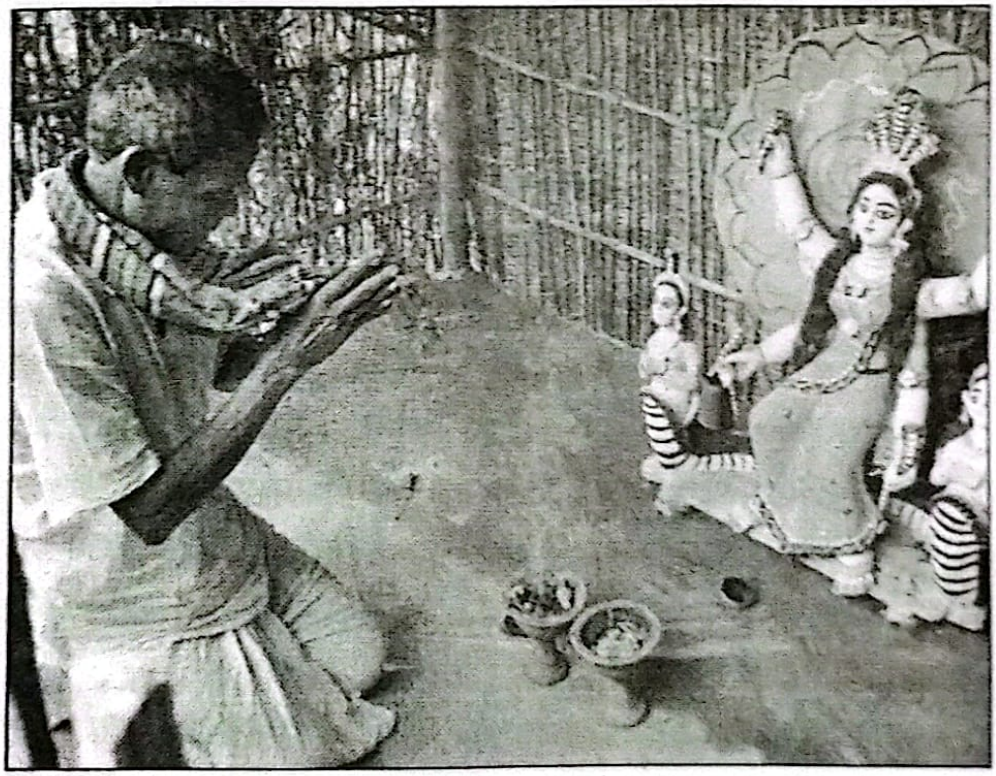
গ্রামের একটি বাড়ির প্রায় পুরোটাই ভাঙা। তারপরও বাড়ির উঠানে অন্যরকম শক্তি নিয়ে বেঁচে আছে ভুনজারদের গৃহ দেবতা 'তুলসী'। সেই তুলসীর সামনে বিনীত ভঙ্গিতে ধূপ জ্বালিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে পূজা দিচ্ছে ছোট্ট একটি মেয়ে। নাম জানালো রিতা ভুনজার। কোন পূজায় বেশি আনন্দ জানতে চাইলে এক বাক্যে রিতার উত্তর 'বিষহরি'।

দেবী দুর্গা ও কালির খুব বেশি প্রভাব আদিবাসী ভুনজারদের মধ্যে দেখা যায় না। এদের প্রাণের দেবী মনসা। দেবী মনসাকে আদিবাসী ভুনজাররা ডাকে 'বিষহরি' নামে। ভুনজারদের বিশ্বাস বিষহরিই তাদের

জিন্দা দেবতা। এরা বিশ্বাস করে বিষহরি দেবীর শক্তিতেই ভুনজাররা সাপে কাটা ব্যক্তিকে মন্ত্র দিয়ে ভালো করতে পারে। এ অঞ্চলে কাউকে সাপে কাটলে সকলেরই শেষ ভরসা আদিবাসী ভুনজাররা। কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই এরা সাপেকাটা রোগীকে মন্ত্র দিয়ে সুস্থ করে তোলে। কি সে মন্ত্র? পাশ থেকে ভাসাই ভুনজার বলতে থাকে বিষ নামানোর মন্ত্র— 'সাপা বলে শোন সাপেনি- গোগনেরই কথা, পঞ্চম তালের বিষ, জন্ম হলো কথা।'

ভাসাই জানালো, ভাদ্র মাসের চাঁদের পূর্ণিমার দিন ভুনজাররা পালন করে বিষহরি পূজা। গোটা গ্রামে তিনদিন ধরে চলে এটি। প্রথমদিন গোত্রের সবাইকে উপোস থাকতে হয়। বিষহরি দেবীকে খুশি করাই উপোসের উদ্দেশ্য। উপোস অবস্থায় খাওয়া যায় শুধুই ফল আর দুধ। ঐদিন সকলেই একত্রিত হয়ে পূজা দিয়ে বিষহরিকে জানায় মনের নানা ফরিয়াদ।

দ্বিতীয় দিনে দেবীর সন্তুষ্টিতে হাঁস বলি দেয়া হয়। সারা বছর ভুনজাররা যে কয়টি সাপেকাটা রোগীকে ভালো করে সে কয়জনকে এই পূজায় বিষহরির সন্তুষ্টির জন্য এক বা একাধিক হাঁস দান করতে হয়।



বিষহরীর পূজা করছেন মহত বাতাসু ভুনজার

অতঃপর নিজেদের ও দানের হাঁসগুলোকে একে একে বিষহরির উদ্দেশ্যে বলি দেয় এরা। এ সময় ভুনজাররা গায় বিষহরির গান—'মন দুঃখে কান্দে, পদ্মা নিধুয়া বলে।' বলি দেয়া হাঁসগুলো দিয়ে মহতের বাড়িতে সকলের জন্য রান্না হয় খিচুরী। সারা রাত চলে ভুনজারদের 'ঝুমটা নাচ'-এর আসর। চলে হাঁড়িয়া আর চুয়ানী খাওয়া।

তৃতীয় দিন পরম ভক্তির সাথে নিকটস্থ নদী বা খাল বা পুকুরে বিষহরিকে বিসর্জন দেয় ভুনজাররা। বিষহরি ছাড়াও আদিবাসী ভুনজারদের মধ্যে ঢোলপূজা পালনের আধিক্য দেখা যায়। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার চাঁদে এরা এ পূজা পালন করে থাকে।

পূজার গন্ধে যখন বিভোর ঠিক তখনই একটি ঘর থেকে একটি আদিবাসী নবজাতকের কান্নার শব্দ শোনা যায়। মাত্র দুদিন আগে জনতা ভুনজারের কোলে জন্ম নিয়েছে নবজাতকটি। গোত্রের মহত জানালো নবজাতকদের নিয়ে ভুনজারদের ধর্মের নানা আচার। যে দিন বাচ্চার নাভি পড়বে সেদিন ভুনজাররা তাদের পূর্বপুরুষদের বিধান মতে বাড়িতে ডেকে আনে নাপিত ঠাকুরকে। নাপিত ঠাকুর গোটা সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের চুল ও দাড়ি কামিয়ে দেয়। পাশাপাশি মহিলাদের কানি আঙ্গুলের নখ ব্লেড দিয়ে সামান্য ঘষে দেয়া হয়। এরা বিশ্বাস করে এতে সকলের শুদ্ধি ঘটে। অতঃপর সকলকেই মিষ্টি মুখ করানো হয়। মহত জানায় ভুনজার সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্নপ্রশান অনুষ্ঠানের পূর্বে তাদের নবজাতকে কোনো নামেই ডাকে না। তারা বলে, 'নাম রাখেল রাখতে বুতুর টুর।' অন্নপ্রশানের দিন বাড়িতে ডাকা হয় গোসাই ঠাকুর বা সাধু বাবাকে। সাধু বাবা দুধ, কলা, বাতাসা, চিনি, মধু ও ঘি একত্রিত করে বিশেষ ধরনের খির তৈরি করে। অতঃপর বাড়ির তুলসী দেবতার সামনে যোগ পূজা দেয়। পূজার পরে নবজাতকের দাদা-দাদী ঐ খির তার মুখে দিয়ে সুন্দর নাম রাখে। অতিথিরা একে একে তুলে দেয় তাদের উপহারগুলো। এরপর সকলকে খিরসহ খাওয়ানো হয় ভাত আর নিরামিষ। মূলত আদিবাসী সংস্কৃতি থেকেই অন্নপ্রশান অনুষ্ঠানটি বাঙালি সংস্কৃতিতে স্থান করে নিয়েছে।

সুশীল ভুনজারের সময় যেন কাটছেই না। অগ্রহায়ণের অপেক্ষায় আছে সে। অন্যান্য আদিবাসীদের মতো ভুনজারদেরও তিনটি কষ্টের

মাসের অবসান ঘটে অগ্রহায়ণে। অগ্রহায়ণ ফসল কাটার মাস। ফসল কাটার প্রথম দিনে ভুনজাররা পালন করে বেশ কিছু আচার। এই উৎসবটিকে এরা বলে 'লবান'। মূলত আদিবাসীদের এই লবান উৎসব থেকেই নবান্ন উৎসবের প্রচলন ঘটেছে।

ফসল কাটার প্রথম দিনে আদিবাসী ভুনজাররা প্রত্যেক বাড়িতে আলাদা আলাদাভাবে পালন করে 'লবান'। বাড়ির যে কোনো একজনকে উপোস অবস্থায় যেতে হয় ধান কাটতে। এর মধ্যেই মহিলারা মাটি দিয়ে বাড়ির উঠান লেপে পরিষ্কার করে রাখে। মাঠ থেকে কিছু ধান কেটে এনে রাখা হয় বাড়ির পরিষ্কার উঠানে। সেখানে সিন্দুর ও ধূপ জ্বালিয়ে পূজা দিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে মুরগি বলি দেয় ভুনজাররা। অতঃপর মাঠ থেকে আনা ধান মারিয়ে নতুন চাল তুলে খিচুরী রান্না করে উপোসকারী উপোস ভাঙে। এরপরেই আনন্দের সাথে চলে হাঁড়িয়া আর চুয়ানী খাওয়া। এটিই 'লবান' উৎসব। তাই অগ্রহায়ণের আগেই ভুনজাররা বলতে তাকে, 'ইন্ন লবান নালা লাগগো।'

ভুনজার গ্রামটিতে কয়টি পরিবার খ্রিস্টান হয়েছে জানতে চাইলে মলিন মুখে উঠে যায় কয়েকজন। কোনো উত্তর মিলে না অন্যদের থেকেও। নিজের সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হওয়ার কষ্টবোধ ভাসাই ভুনজারের মতো অনেককেই আজ কুরে কুরে খায়। অভাব দূর করতে ধর্মান্তরিত হওয়া যায়, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসকে সত্যিকার অর্থে মন থেকে বদলানো যায় না। যারা ধর্মান্তরিত হয়নি তাদের কাছে প্রশ্ন ছিল কেন অন্য ধর্ম গ্রহণ করছেন না। প্রশ্ন শুনে উঠানের এককোণ থেকে জনতা ভুনজার গর্জে ওঠে, উচ্চ কণ্ঠে বলে, 'যেটাই জন্ম হইয়া আইছি সেটি মৃত্যু হমু।' জনতার প্রতিবাদের ভাষায় আমরা মুগ্ধ হই। নীরবে ভাবি হয়তো এই প্রাণশক্তিই ধর্মান্তরিত না হওয়া আদিবাসীদের মূল শক্তি।

সাপ্তাহিক, ৮ এপ্রিল ২০১০



কড়া : নিশ্চিহ্নপ্রায় এক আদিবাসী সম্প্রদায়

গ্রামের নাম ঝিনাইকুড়ি। কোনো এক সময় এখানকার লোকেরা ঝিনুক কুড়িয়ে তা ধান ও চালের বিনিময়ে বিক্রি করতো। সে থেকেই নাকি গ্রামের এমন নামকরণ হয়ে যায়। পাকা রাস্তাটি দিনাজপুর শহর থেকে এসে বিরল উপজেলার বুক চিরে সোজা চলে গেছে সীমান্তের দিকে। ওপারে ভারতের কুসমণ্ডি থানার বোসাইল গ্রাম। আর এপাশে ঝিনাইকুড়ি, বহ্বলদিঘি আর কালিয়াগঞ্জ গ্রাম।

বহ্বলদিঘির ঠিক আগে একটি মেঠোপথ হেলেদুলে চলে গেছে ঝিনাইকুড়ি হয়ে হালজায়। সারি সারি তুতগাছ রাস্তার দুধারে। সবুজ তুতপাতা দুদিক থেকে যেন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে একটি সবুজ সুরঙ্গপথে আমরা চলছি।

রাস্তাটি বেশ ভাঙাচোরা। হয়তো গ্রামের কর্তাব্যক্তিদের নেক দৃষ্টি পড়েনি এখানটায়। কিন্তু তাতে কি। রাস্তার দুদিকে সবুজ ধানক্ষেতের আলিঙ্গন। বিস্তীর্ণ সবুজের মাঝে ক্ষণে ক্ষণে চলছে ঢেউ ঢেউ খেলা। সবুজ ধানক্ষেত আর তুতগাছের সুরঙ্গ পেরিয়ে কখন যে হালজায় ঢুকে পড়েছি, টেরই পাইনি।

রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল মধ্যবয়সী এক যুবক। কড়া গ্রাম কোনটি? প্রশ্ন করতেই সে আঙুলের ইশারায় দূর থেকে দেখিয়ে দেয় বিধ্বস্ত এক ছোট্ট জনপদকে।

রবাট দিনাজপুরবাসীর অতি পরিচিত মুখ। পুরোনাম রবাট আর এন দাশ। একজন মুক্তিযোদ্ধা। 'বাঁচার পথ' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করছেন আদিবাসীদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য। রবাটের কাছ থেকে আমরা প্রথম শুনি আদিবাসী কড়াদের কথা। সে জানায় কড়াদের নিয়ে অবাক করা সব তথ্য।

এ দেশে টিকে আছে আদিবাসী কড়া সম্প্রদায়ের মাত্র ১৯টি পরিবার। এর মধ্যে হালজায় গ্রামে ১৬টি, বৈরাগি পাড়ায় ১টি আর সদর উপজেলার ঘুঘুডাংগার খাড়ি পাড়ায় ২টি পরিবারের বাস। কড়া নামের একটি জাতি হারিয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে। হারিয়ে যাচ্ছে একটি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি আর আচারগুলো। আমরা আর দেরি করি না, রবাটের কাছে জেনে নেই কড়া গ্রামের ঠিকানাটি।

রাস্তার দুদিকে মাটি আর ছনের তৈরি দশ-বারটির মতো ঘর কড়া গ্রামটিতে। অধিকাংশই ভেঙে গিয়ে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে। এনজিওদের দেয়া দুটি পাকা ল্যাট্রিন আর একটি টিউবওয়েলই গ্রামটিতে আধুনিকতার একমাত্র ছোঁয়া।

কড়া গ্রামটির ভিতরে ঢুকতেই একটি বেড়ার বাধা ঠেকলো। পেছন থেকে একজনের কণ্ঠ— 'টেটিয়ে নারায় দিহিরে' (বেড়াটি সরিয়ে দে)। পিছন ফিরতেই দেখি সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। চোখেমুখে বয়সের ভাঁজ। কড়া ভাষায় সে বাচ্চাদের হুকুম দিচ্ছে বেড়াটি সরিয়ে দেয়ার।

কড়া গ্রামের ভিতরে যেতে যেতে জানলাম লোকটি গোত্রের মাহাতো। নাম জগেন কড়া। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো কড়ারাও



কারমা পূজার উপোসের ডালা হাতে কড়া নারী

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বেটকী (সভা) ডেকে ভোটের মাধ্যমে গঠন করে মাহাতো, গড়াৎ ও পারামানি নামের ৩ সদস্যের পরিষদ। এক সময় আদিবাসী কড়াদের কয়েকটি গ্রামের একজন প্রধান থাকতো। কড়া ভাষায় তাঁকে বলা হতো 'পাঁড়ে'।

ঘরের সামনে ছোট একটি বেঞ্চ পেতে আমাদের বসতে দেয় জগেন। পাশের ঘর থেকে কড়াদের আঞ্চলিক পোশাক উকানি পরিহিতা সুনিয়া কড়াও এসে বসে জগেনের পাশে। একে একে জগেন আর সুনিয়া কড়া বলতে থাকে তাঁদের পূর্বপুরুষদের কথা, ধর্ম, সংস্কৃতিসহ নানা বিষয়গুলো।

কড়া মানে কি? সাথে সাথেই জগেন উত্তর দেয়। কড়া মানে 'মাটি খোঁড়া'। এক সময় এ সম্প্রদায়ের লোকেরা দিঘি খোঁড়ার কাজে যুক্ত ছিল। সে থেকেই এরা 'কড়া'। ইংরেজ আমলে সারা ভারতজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বসেছে রেললাইন। পাহাড় কেটে, মাটি খুঁড়ে সেই রেললাইন বসানোর কাজে ঘাম ঝরিয়েছে এই আদিবাসীরাই। আর সেই রেললাইনের কাজ করতে করতেই ব্যাপক পরিমাণ আদিবাসী চলে আসে এ দেশে। বসতি গাড়ে, নিজেদের সংস্কৃতি আচার-আচরণকে বাঁচিয়ে রাখতে সবাই মিলে থাকতে শুরু করে একসাথেই। জীবিকার তাগিদে দেশ ছাড়া সেই আদিবাসীরাই এদের পূর্বপুরুষ। মূলত এরা এসেছে ভারতের ঝাড়খণ্ড থেকে।

কড়াদের ধর্ম কি? জানতে চাইলে, সুনিয়া মুখ খোলে। এককথায় বলে ধরম (ধর্ম) 'কারমা'। কোনো দেবদেবীর পূজা না করলেও এরা ভাদ্র মাসে 'কারমা পূজা' পালন করে ধুমধামের সাথে। মূলত এটি গাছের পূজা। বিশেষ প্রজাতির 'খিল কদম' গাছের ডাল কেটে এনে পূজা করে এরা।

কড়াদের কারমা পূজায় বিবাহিতরা 'খিল কদম' গাছের ডাল কাটতে পারে না। গোত্রের মাহাতো পূর্ব থেকেই অবিবাহিত কোনো যুবককে কয়েক বছরের জন্য ডাল কাটা ও বির্সজনের জন্য মনোনীত করে দেন। ডাল কাটার দিন নদীতে স্নান করে গাছের গোড়ায় ধূপ জ্বালিয়ে, সিঁদুর দিয়ে ৩টি তেলের পিঠা গাছের সাথে বেঁধে দেয়া হয়। অতঃপর ৩ চটে (৩ কোপে) ডাল কাটা হয়। ডালটি মাটিতে পড়ার পূর্বেই সেটি ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়া হয় পূজাস্থলে।

সেখানে গোত্রের সবাই ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ডালটিকে মাটিতে গেড়ে দেয়। একই সাথে দুটি লাল মুরগা (মোরগ) বলি দেয়ার মাধ্যমে শুরু হয় কারমা পূজার আনুষ্ঠানিকতা। সারা রাত চলে নাচ, গান আর হাঁড়িয়া খাওয়া।

ভোরবেলা দলের মাহাতো স্নান সেরে ভেজা শরীরেই প্রথমে এক বাটি দুধ ঢেলে দেয় খিল কদম গাছের ডালের মাথায়। অতঃপর তাকে ভক্তি করে ফিরে যায় নিজ বাড়িতে। মাহাতোর পরপরেই অন্যান্যরা একে একে দুধ ঢালতে থাকে। দুধ ঢালা শেষে যে যুবকটি ডাল কেটেছিল সে প্রথমে ডালটির চারদিকে ৩ পাক ঘুরে ডালটিকে টান দিয়ে কাঁধে তুলে নেয়। অতঃপর ঢাক-ঢোলের তালে তালে সেটিকে বির্সজন দেয় নিকটবর্তী নদী বা পুকুরে।

জগেন কড়া জানালো কারমা পূজায় নাকি কড়াদের ধর্মের পরীক্ষা দিতে হয়। বাঁশের ডালার মধ্যে কালাই বীজ রেখে বালু ও মাটি দিয়ে যেদিন ঢেকে দিতে হয় সেদিন থেকে শুরু হয় উপোস (উপাস)। উপোস সময়ে রসুন, পেয়াজ, গরমভাত, মাছ ও মাংস খাওয়ার নিয়ম নেই। খেতে হয় শুধুই নিরামিষ। যে কয়জন উপোস থাকে সে কয়টি ছোট কাঠি ডালায় পুতে দেয়া হয়। কড়াদের রীতি অনুসারে উপোসকারী পুরুষ হলে কাঠির মাথায় কাজল আর মহিলা হলে সিঁদুর লাগানো হয়।

চারদিন পর ডালায় নতুন চারা গজালে এরা উপোস ভাঙে। কড়াদের বিশ্বাস যাদের ধর্মে বিশ্বাস নেই ডালায় তাদের লাগানো কালাই বীজ থেকে চারা গজায় না। চারা গজালে বন থেকে কেটে আনা খিল কদম গাছের ডাল মাটিতে পুতে চারার ডালাটিও তার পাশে রাখা হয়।

কেন কারমা পূজা পালন করতে হয়? এরকম প্রশ্নে জগেন মুচকি হাসে। মাটিতে আয়েশ করে বসে ধীরে ধীরে বলতে থাকে কারমা পূজা নিয়ে কড়াদের বিশ্বাসের মিথটিকে—

"কারাম আর ধারাম ছিল দুই ভাই। কারাম বড় আর ধারাম ছোট। তাদের একমাত্র আদরের বোনের নাম পারাবেতী। একবার ভদ্র মাসে গ্রামের এক ধনী ব্যক্তি ঢোল পিটিয়ে তার জমিতে ধান গাড়ার 'হাউলি'র (কাজের বিনিময়ে খাওয়ার দাওয়াত) ডাক দেয়। গ্রামের অন্যদের সাথে কারাম আর ধারামও যায় সেখানে। ভোর বেলা কিছু চারা লাগিয়ে সকালের নাস্তা হিসেবে পনতা (পানতা) খেতে দুভাই কলাপাতা নিয়ে বসে যায়

লাইনে। কিন্তু কারাম আর ধারামের কাছে এসেই পানতা শেষ হয়ে যায়। পানতা খেতে না পেরে দুভাই বড়ই দুঃখ পায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বড় ভাই কারাম ছোটকে সান্ত্বনা দেয় দুপুরের খাবার পাওয়ার আশায়।

সব ভুলে দুভাই আবার কাজে ফিরে যায়। ধান গাড়া শেষ হয় দুপুরের দিকে। তারা আবারও কলা পাতা নিয়ে অন্যদের সাথে বসে পড়ে লাইনে। কিন্তু এবারও ঘটল একই ঘটনা। তাদের পর্যন্ত এসেই খাবার শেষ হয়ে যায়। এবার তারা খুবই কষ্ট পেল। প্রচণ্ড রাগে ও কষ্টে ছোটভাই তার গাড়া ধানের চারাগুলো তুলে ফেলতে চাইলো। কিন্তু বড়ভাই কারাম তাকে শান্ত করে বাড়ির দিকে রওনা হয়। পথেই তাদের সাথে দেখা হয় এক বটগাছের। তাদের দুঃখের কথা শুনে বটগাছ বলে, 'তোদের কারমা কপাল জেড় গেল' (তোমাদের কর্মভাগ্য পুড়ে গেছে)। সে উপদেশ দেয় সাত সমুদ্র লংকা পার হয়ে কর্মভাগ্য নিয়ে আসার।

বটগাছের কথা বিশ্বাস করে কারাম আর ধারাম বাড়ি থেকে ক্ষুদভাজা নিয়ে রওনা হয় কর্মভাগ্য আনতে। কিছু দূর যেতেই তাদের সাথে দেখা হয় একটি কুল গাছের। কারাম-ধারাম-এর কথা শুনে সেও জানায় তার দুঃখের কথা। তার ফল পেকে মাটিতে পড়ে থাকে কিন্তু কেউ খায় না। তার ভাগ্যটিও জেনে আসার জন্য দুভাইকে সে অনুরোধ করে। যেতে যেতেই কারাম-ধারাম এর দেখা হয় একটি ডুমুর গাছের সঙ্গে। ডুমুর গাছ তাদের লঙ্কা পার হওয়ার কথা শুনে দুঃখ করে বলে তার সুদৃশ্য ফল পেকে যায় কিন্তু মানুষ ও পাখি সেদিকে ফিরেও তাকায় না। এ নিয়ে তার অনেক দুঃখ। সে অনুরোধ করে তার ভাগ্যটিও জেনে আসার। কিছুদূর যেতেই কারাম আর ধারামের সামনে পড়ে একটি নদী। নদীর তীরে দুটি হাতি মারামারি করছিল। তাদের পুরো শরীর কাদায় ঢাকা। কারাম-ধারামের কথা শুনে তারা দুঃখ করে বলে তারা জানে না আর কতদিন তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে কাদায় ঢাকা থাকবে। দুভাইকে তারা অনুরোধ করে তাদের ভাগ্যটিও জেনে আসার। নদী পার হয়ে কিছুদূর যেতেই কারাম-ধারাম লঙ্কার সমুদ্রের কাছে এসে পৌছায়। বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেয়ার চিন্তায় তারা সমুদ্রপাড়ে বসে থাকে।

সমুদ্রে একটি বড় কুমিরের গলায় সাতদিন ধরে কাটা বিঁধে থাকায় সে কারাম-ধারামের সাহায্য চায়। সমুদ্র পার করানো ও নিয়ে আসার শর্তে

কারাম-ধারাম কুমিরের গলার কাটা বের করে দেয়। কুমিরের পিঠে চড়ে দুভাই লঙ্কার সমুদ্র পার হয়েই দেখা পায় কর্মভাগ্যের। কর্মভাগ্যের সারা শরীর তখন পোকায় খাচ্ছিল। কারাম-ধারাম যখনই তা স্পর্শ করল তখনই সেটা গাছ হয়ে গেল। কারাম-ধারামের মধ্যে অন্য রকম শক্তির সঞ্চার হলো। তারা সেই গাছ ঘাড়ে নিয়ে ফিরতে থাকলো।

ফেরার পথে হাতি দুটো তাদের ভাগ্যের কথা জানতে চাইলে কারাম ধারাম বলল, 'তোমাদের এমন একজন লাগবে যে তোমাদের শরীর পরিষ্কার করে দিবে।' হাতি দুটি তাদেরকে সাথে নিয়ে যাওয়ার মিনতি করলো। কারাম-ধারাম তখন দুই হাতির পিঠে চড়ে বসল। এরপর ডুমুর গাছ তার ভাগ্যের কথা জানতে চাইলে তারা বলল, 'তোমার গোড়ার মাটির নিচে সাত কলসি ধন আছে সেটি সরালেই তোমার ফল সবাই খাবে।' ডুমুর গাছ কারাম-ধারামকে সাত কলস ধন তুলে নেয়ার অনুরোধ করল। তারা সাত কলস ধন হাতির পিঠে তুলে নিল। কুল গাছের সাথে দেখা হতেই কারাম-ধারাম তাকেও একই কথা বলল। সেও তার গোড়ার মাটির নিচের সাত কলস ধন তুলে নেয়ার মিনতি করল। কারাম-ধারাম তাই করল। এভাবে তারা কর্মভাগ্য নিয়ে সেই বটগাছের কাছে চলে আসল। বটগাছ লঙ্কা পাড় হয়ে আনা কর্মভাগ্যরূপী গাছটিকে মাটিতে গেড়ে তাদের বোন পারাবেতীকে দিয়ে পূজা করার নির্দেশ দিল। তারা তাই করলো'। এ ঘটনার পর থেকেই কড়ারা কারমা পূজা পালন করে আসছে।

কারমা পূজা হয় অভাবের মাস ভাদ্রে। কড়া সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা আজো বিশ্বাস করে কারমা তাদের অভাবমুক্তি আর সৌভাগ্য লাভের পূজা। প্রতিবছর এ পূজা পালন করলেও আদিবাসী কড়াদের কর্মভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়নি অদ্যাবধি। বরং অর্থের অভাবে পূজার উৎসবগুলোও চলছে ঢিমেতালে। গোত্রের মাহাতো মনে করে কারমা ও ধারমার মতোই কপাল পুড়ে আছে এখানকার কড়াদের। তবুও বুকভরা আশা নিয়ে প্রতিনিয়ত ভাগ্যজয়ের চেষ্টা চালায় আদিবাসী কড়ারা।

আমাদের কথার আসরে যোগ দেয় এক যুবক। নাম জানালো কৃষ্ণ কড়া। সে গোত্রের একমাত্র শিক্ষিত ছেলে। কোন পর্যন্ত পড়েছেন জানতে চাইলে, বেশ গর্ব নিয়েই বলেন 'মেট্রিক ফেল'। শিক্ষিত হলেও নিজ জাতির সংস্কৃতি রক্ষায় তিনিই বেশ সচেষ্ট। পূজার গল্প শুনে নিজেই শুরু

করেন বিষহরির কথা। কড়া সম্প্রদায়ের আদিবাসীরাও পালন করে 'বিষহরি পূজা'। তবে তা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো নয়। একেবারেই ভিন্ন। বিষহরির কথা শুনেই পাশ থেকে সুনিয়া গান ধরে—

'ডেংকি লেবেত কুরকি
অমুল করোক মেন
চাউলী কুরি কুড়কি
সাংখ্যা নাছেক মেন'

কড়ারা বিশ্বাস করে এ পূজায় তাদের অভাব ও কষ্টের কথা শুনতে তাদের ওপরই ভর করে নেমে আসে ৬টি ভূত (দেবতা)। কৃষ্ণ পূজার নিয়মসহ হর্ হর্ করে বলতে থাকে ভূতগুলোর নাম। গাঁও রাখ ওয়াল, দানব, বিষহরি, চকর গুরু, কামরুক গুরু, বাংশিং গুরু। এ পূজায় মাটি দিয়ে উঠানে ৪ আঙ্গুল উঁচু ডিবি তৈরি করে সেখানে ধূপ জ্বালিয়ে, সিঁদুর দিয়ে কবুতর বলি দেয়া হয়। ভূত বা দেবতাকে শান্ত করার জন্য রাখা হয় বিশেষ ধরনের গাছের চাবুক। ভক্তি করে মাদল বাজিয়ে এরা নাচতে নাচতে দেবতাদের ডাকতে থাকে। কড়ারা বিশ্বাস করে এতে গোত্রের তুলা রাশির ব্যক্তিদের ওপর দেবতা ভর করে। কখনো কখনো দেবতা আসতে দেরি হলে পুতার (মসলা বাটার) পাথরে ধূপের ধোয়া দিয়ে তার ওপর তুলারাশির লোক দাঁড় করালেই দ্রুত দেবতারা চলে আসে। দেবতাদের প্রথমে চাবুক দিয়ে শান্ত করে বলা হয় 'মাহারাজ তয় শান্ত হওয়া'। দেবতারা শান্ত হলে গোত্রের সকলেই নানা রোগ-শোক ও সমস্যার কথা তাকে জানায় এবং সমাধানের মিনতি করে।

কারমা ও বিষহরি ছাড়াও গবাদিপশুর মঙ্গলের জন্য কড়া সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা পালন করে বিশেষ ধরনের পূজা। কড়া ভাষায় এটি 'গট পূজা'। এ পূজায় কাদামাটির ওপর ডিম রেখে, সেখানে সিঁদুর দিয়ে, ধান আর দূর্বা ঘাসে ঢেকে দেয়া হয়। অতঃপর তার ওপর দিয়ে গোত্রের সকলের গরু একসাথে নিয়ে যাওয়া হয়। যার গরুর পায়ে লেগে ডিমটি ভেঙে যায় তাকে সকলে ঘাড়ে চড়িয়ে হৈহুল্লোর করে তার বাড়িতে নিয়ে আসে। সবাইকে তখন অন্যান্য খাবারের সাথে খাওয়ানো হয় হাঁড়িয়া। নিয়মমতে ঐদিনই সূর্য ডোবার আগে ঐ ব্যক্তি তার গোয়াল ঘরটি পরিষ্কার করে সেখানে একটি পিঁড়ি রাখে। পিঁড়ির চারপাশে গোল করে ঢেলে দেয়া

হয় চালের আটা। অতঃপর পিঁড়ির ওপর ধান, দূর্বা ঘাস আর সিঁদুর দিয়ে ভক্তি দিয়ে গবাদিপশুর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়।

পূজার আনন্দের কথা শুনতে শুনতে আমরা আদিবাসীদের ঘরগুলো ঘুরে দেখি। আগ্রহ নিয়ে সুনিয়া কড়া তার ঘরটির দিকে আমাদের নিয়ে যায়। কড়া গ্রামের শেষপ্রান্তে চারপাশে মাটি আর উপরে ছনেঘেরা ঘরটিই সুনিয়ার। এক সময় এখানে তাদের শত শত বিঘা জমি ছিল। এখন তার অধিকাংশই স্থানীয় ভূমিদস্যুদের দখলে। আপনমনেই সুনিয়া বলতে থাকে তার জীবনকাহিনী।

মেয়ের বয়স যখন ৫ বছর তখনই সুনিয়ার স্বামী মারা যায়। সে থেকেই শুরু হয় জীবনযুদ্ধ। মেয়ে বড় হতেই সুনিয়ার দুঃখ আরো বেড়ে যায়। কড়াদের ধর্মমতে নিজ গোত্র ছাড়া অন্য গোত্র বা সম্প্রদায়ে বিয়ে নিষিদ্ধ। কিন্তু এ দেশে টিকে থাকা কড়াদের মধ্যে তার মেয়ে ফুল কড়াকে বিয়ে করার মতো প্রাপ্তবয়সী কোনো ছেলে নেই। তাই নিজ ধর্মের বিধান ভেঙে বাধ্য হয়েই মেয়েকে বিয়ে দিতে হয় অন্য সম্প্রদায়ের ছেলের সাথে। নিঃশব্দেই বিয়ে হয় ফুল কড়ার। কিন্তু জাতিভেদের কারণে টিকে থাকেনি ফুল কড়ার সংসার। কয়েক মাসের মধ্যেই গোত্রের



অভাবের ভাদ্রে সেড়তি কড়া

মাহাতো ফিরিয়ে আনে তাকে। মেয়েকে নিয়ে তাই দুঃখের সময় কাটে সুনিয়ার।

নিজ সম্প্রদায়ে মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলেও এই গ্রামেই এক সময় ধুমধামের সাথে বিয়ে হয়েছিল সুনিয়ার। স্মৃতি হাতরিয়ে সুনিয়া বলতে থাকে সেসব কথা।

বিয়ের প্রথমে ঘটক বা 'কারোয়া'র সাথে তাকে দেখতে আসে ছেলের বাবা। আপ্যায়নের পর মেয়ে পছন্দ হতেই পাকাপাকি হয় বিয়ের কথাবার্তা। সে আনন্দে চলে হাঁড়িয়া খাওয়া। আদিবাসী কড়াদের বিয়েতে এখনো মেয়েকে পণ হিসেবে দিতে হয় ২৫ টাকা। তাছাড়াও মেয়েপক্ষকে ৭টি শাড়ি, ৩ সের খাবার তেল, ৩ পুরিয়া সিন্দুর আর 'ডারিয়া ঝোপা' (কোমরে সাজানোর এক ধরনের উপকরণ) দেয়ার বিধান চালু আছে। কড়াদের বিয়েতে বাড়ির উঠানে পাতা দিয়ে 'মারোয়া' সাজানো হয়। মাটি উঁচু করে চারদিকে ৪টি কলাগাছ, ৪টি তির, কাল সাট লিয়া (মাটির ঘটি বিশেষকে বলা হয়) রেখে সুতা দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়। বিয়ে বাড়ির উপরে বাঁশ দিয়ে উঁচু করে টাঙাতে হয় 'বাদর'। খর দিয়ে মানুষের প্রতিকৃতি তৈরি করে তাতে তীর-ধনুক লাগিয়ে তৈরি করা মূর্তি বিশেষকে কড়ারা 'বাদর' বলে। এরা মনে করে বাদর টাঙিয়ে সারা গ্রামে তাদের বিয়ের জানান দেয়া হয়।

কড়াদের বিয়ের পর্বটি বেশ অন্যরকম। বিয়েতে বরপক্ষকে প্রথমেই কনের বাড়িতে ঢুকতে দেয়া হয় না। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে কোনো জায়গায় তাদের বসতে দেয়া হয়। সেখানেই তাদের খাওয়ানো হয় ভাত, ডাল ও সবজি প্রভৃতি। আদিবাসী কড়ারা একে বলে জাতি মিলনের ভাত বা 'জাতি মিলন'। অতঃপর শুধু বরকে বাড়িতে এনে প্রদীপ, ধান ও ঘাস দিয়ে বরণ করা হয়। একে 'চুমারে' বলে। একইসাথে বরকে খাওয়ানো হয় গুড়। কড়া ভাষায় সেটি 'গুড় খিলা'। গুড় খাওয়ানোর পর বর আবার পূর্বের স্থানে চলে যায়। খানিক পরে কনের বাবা বরকে আবার নিয়ে এসে পরিয়ে দেয় রূপার আংটি। আংটি পরানোর পরও বর থাকতে পারে না, চলে যায় পূর্বের জায়গায়।

অতঃপর কনের বাড়িতে আসে নাউয়া (নাপিত)। নাউয়া কন্যার হাতের কানি আঙ্গুল কেটে সামান্য রক্ত নিয়ে তার সাথে আতপ চাল একত্র

করে মহুয়া পাতা দিয়ে কন্যারই হাতে বেঁধে দেয়। কড়া ভাষায় এটি 'নিউওয়ে'। বরকেও একইভাবে বাড়ি থেকে মহুয়া পাতা বেঁধে আসতে হয়। এর পরেই কনের গোসলপর্ব। কড়ারা বলে, 'কে নিয়া নাহা বে, এয়া দশ জনা'। কড়াদের বিয়েতে কনেকে গোসল করাতে লাগে ১০ জন লোক। এদের মধ্যে ৫ জন মরত (পুরুষ) ও ৫ জন মেয়ে হতে হয়। কড়া সম্প্রদায়ে মেয়ের বাবাকেই বিয়ের শাড়ি দিতে হয়। গোসলের পরই বিয়ের শাড়িতে সাজানো হয় কনেকে। অতঃপর শুরু হয় বিয়ের মূল পর্ব। এটিকে বলে 'সিমরেত হতে' বা সিন্দুর পর্ব।

বিয়ের এ পর্বটি বেশ নাটকীয়। কনের ভাইকে উঠতে হয় তার দুলাভাইয়ের কাঁধে আর বরকে গামছা নিয়ে উঠতে হয় তার দুলাভাইয়ের (বোহনে) কাঁধে। এ অবস্থায় বর তার কাছে থাকা গামছাটি কনের ভাই বা শালাকে দিয়ে দেয়। আর শালা ঐ অবস্থায় বরকে পান খাইয়ে দেয়। পান খাওয়ানোর পর শালা ঐ গামছাটি বরের কাঁধে পরিয়ে দেয়। গামছা পরানোর সাথে সাথেই বর কাঁধ থেকে নেমে আসে। কড়াদের ভাষায় এটি 'সারা ধতি'। মাটিতে নেমেই বর চলে আসে সাজানো মারোয়ার দিকে। আদিবাসী কড়ারা বলে, 'হামনি কে বিয়ে অন্য আদমিকে নাই দেখিন দিব' (আমাদের বিয়ে আমরা অন্যকে দেখতে দেই না)। এ সম্প্রদায়ের বিয়েতে বর-কনের সিঁদুরপর্ব হয় চাষাবাদের প্রতীক জোয়ালের উপর দাড়িয়ে গোপনীয়ভাবে। দুপক্ষের মাহাতোর উপস্থিতিতে জোয়ালের দুদিকে বর ও কনে দাঁড়ানোর পর পরই চারদিকে কাপড় দিয়ে ঘিরে দেয়া হয় আর ঐ অবস্থায় বর কনেকে সিঁদুর পরায়। সিঁদুর পর্বের পরই বর-কনেকে খাওয়ানো হয় 'খির'।

সিঁদুর পর্বের পর বর-কনেকে পালন করতে হয় 'খান্দা' বা দশের খাবার পর্ব। নয়া হাঁড়িতে বা যেটিতে সকলের খাবার রান্না হচ্ছে সেই হাঁড়িতে একটি কুলায় থাকা ঘাস, চাল ও ধান বর-কনেকে এক সাথে ঢেলে দিতে হয়। এটিই খান্দা পর্ব। আদিবাসী কড়ারা বিশ্বাস করে খান্দা পালনের পর থেকেই বর-কনে ধর্মীয়ভাবে স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায়।

খান্দা শেষে রাতভর চলে হাঁড়িয়া খাওয়া আর কড়া সম্প্রদায়ের 'ঝুমের নাচ'। আনন্দের সাথে কড়ারা বলে, 'মারোয়ামে ঝুমের নাচ বে, হেরিয়া সবিল মিলকে পি বে'। অন্যদিকে চলে বর-কনের দান বা 'বান্দা

পানি' পর্ব। পরিচিতজনেরা ঘাস আর ধান ছিটিয়ে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করে আর কনের হাতে গুজে দেয় নানা উপহার।

কড়াদের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে বর কিংবা কনেকে হলুদ দেয়ার সময় গান গাইতে হয়। সুনিয়া জানালো কোনো পুরুষ যে কোনো কনে বা বরকে হলুদ দেয়ার সময় গাইতে হয়—

একা পুতা, একা হাম
টাকা হারা দি চারায়।

আবার কোনো মেয়ে বা মহিলা যে কোনো কনে বা বরকে হলুদ দেয়ার সময় গায়—

একা পুতা, একা হাম
টাকা ওয়াহি হারা দি না ভায়।

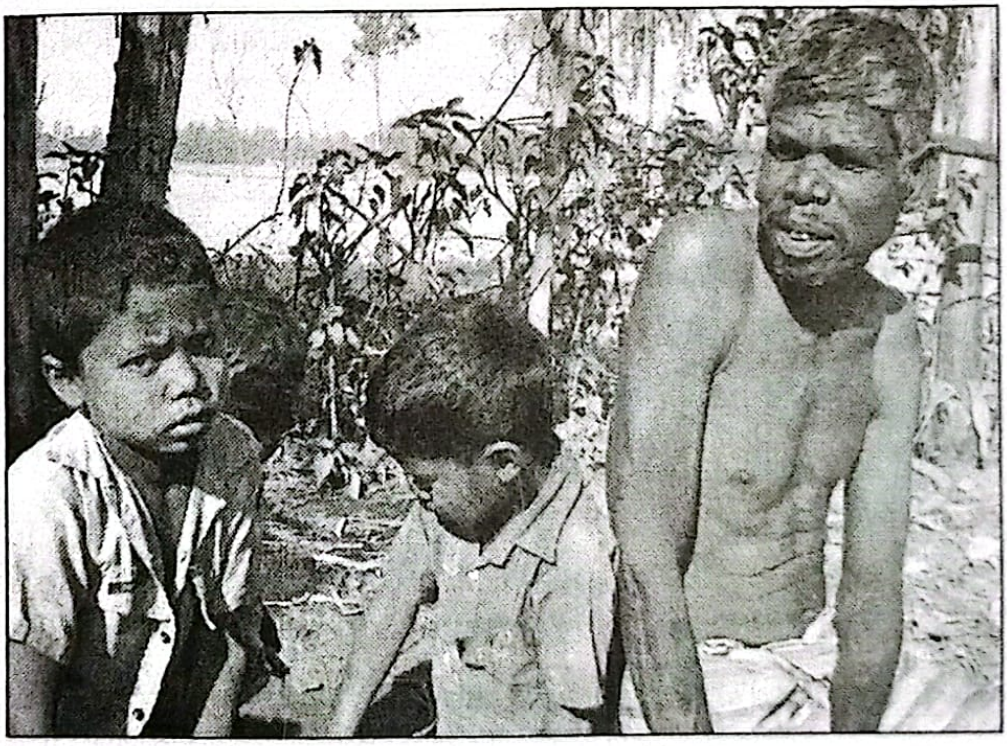
কড়া সম্প্রদায়ে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হলে বা বিবাহবিচ্ছেদ ঘটলে উভয়পক্ষের মাহাতো ও দশজনের উপস্থিতিতে পালন করে বিশেষ ধরনের আচার। কড়ারা এটিকে বলে 'পাতপানি' বলে। তাদের ভাষায় 'পাতপানি ফয়ের দেবো'। একটি কাঁসার বাটিতে পানি নিয়ে ৪/৫টি আমপাতাসহ একটি ভাঙা ডাল ডুবিয়ে রাখতে হয়। অতঃপর কাঁসার বাটির দুদিকে দাঁড়িয়ে স্বামী ও স্ত্রী দুটি পাতা ধরে এবং একইসাথে টেনে পাতা ছিঁড়ে ফেলে। প্রথা অনুসারে পাতা ছেঁড়ার সাথে সাথেই তাদের বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটে।

সুনিয়ার পাশের বাড়িটি সেড়তি কড়ার। বয়স নব্বইয়ের মতো। কিন্তু এখনো বেশ উদ্যোমী ও প্রাণবন্ত। প্রস্তুতি নিচ্ছেন রান্নার। একমনে কিছু একটা কুটছেন। সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেশ কিছু শামুক। কি রান্না হবে? মুচকি হেসে বলেন, 'ঘংঘি' (শামুক)। হঠাৎ দৌড়ে সেখানে উপস্থিত হলো ৫-৬ বছরের কয়েকটি বাচ্চা। সকলেই বেশ আনন্দিত। সকলের হাতে বড় সাইজের আধ মরা কয়েকটি ইঁদুর। মুসা, মুসা বলে চেঁচাচ্ছে সবাই। আমরা এর কিছুই বুঝতে পারলাম না। পরে জানলাম কড়া ভাষায় 'মুসা' অর্থ 'ইঁদুর'। মুসা ছাড়াও কড়া সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের প্রিয় খাবার খোকরা (কাঁকড়া), কুচিয়া, দুরা (কচ্ছপ), ধারা, ঝিনুক, কুকুরী প্রভৃতি।

জগেন কথা তোলে শিকার নিয়ে। পূর্বপুরুষের আমল থেকেই কড়ারা শিকার করে পাশের কালিয়াগঞ্জ শালবনে। শিকারের সময়টাতে কড়া

ভাষায় গোত্রের একে অপরকে বলে— 'আজ হামনি ঘেড়ামারাল জেবে'। শিকারের উদ্দেশ্যে বনে ঢোকার আগে এরা 'দানো ভূতকে' সন্তুষ্ট করতে পূজা করে। মাটি পরিষ্কার করে সেখানে বিজার (তীর), ধেনী (ধনুক) রেখে ধূপ জ্বালিয়ে মাটিতে সিন্দুর আর দূর্বাঘাস রেখে দানো ভূতের উদ্দেশ্যে সেজদা করে কড়ারা। এদের বিশ্বাস এতে জঙ্গলের বিপদ আপদ থেকে রক্ষাসহ অধিক শিকার মিলে।

শিকারের কথা শেষ হতেই কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে সেড়তি জানালো কড়াদের কষ্টের কথাগুলো। এক সময় এ অঞ্চলে কড়া সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের জমি ছিল শত শত বিঘা। তখন অভাব বলতে কিছুই ছিল না। পূজা পার্বণ পালন হতো ধুমধামের সাথে। এখন সবকিছু একেবারে বদলে গেছে। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই তিন মাস আদিবাসী কড়াদের কষ্টের সময়। এ সময়টাতে কোনোই কাজ পায়না এরা। আগে জমির ঘাস তোলার কাজ থাকতো। বর্তমানে রাসায়নিক সার ছিটানোর ফলে জমিতে আর আগাছা হয় না। ফলে এ সময়টাতে কর্মহীন হয়ে পড়ে কড়ারা। মহাজনের নিকট কম রেটে আগাম শ্রম বিক্রি আর বন থেকে কুড়িয়ে আনা জংলি আলু আর কচু খেয়েই কড়ারা পার করে দেয় অভাবের মাসগুলোকে।



কড়া গোত্রের মাহাতো জগেন কড়া

আমাদের আশেপাশে ভিড় করে বেশ কয়েকটি শিশু। এ গ্রামটিতে শিশুদের সংখ্যা ত্রিশের মতো। তাদের শরীরের গড়নই বলে দেয় অধিকাংশই পুষ্টিহীন। চার বছর বয়সী উপেল কড়ার কাছে তার নাম জানতে চাইলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। পাশ থেকে কৃষ্ণ 'কড়া' ভাষায় বলে, 'তোর নাম কয়েন লাগলো'। নিজের ভাষায় কথাগুলো বুঝতে পেরে বাচ্চাটি তার নাম জানালো। কৃষ্ণ জানালো অন্যান্য আদিবাসীদের মতো কড়া গ্রামের শিশুরাও তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এক সময় গ্রামটিতে আরডিআরএস-এর একটি আদিবাসী স্কুল ছিল। বর্তমানে সেটি অন্যত্র চলে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে কড়া গ্রামের আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা।

কথা বলতে বলতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। গোত্রের মাহাতো জগেন আমাদের নিয়ে আসে গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে। সেখানে গিয়ে দেখি আরেক কাণ্ড! একদল কড়া নারী একে অপরের মাথার উঁকুন আনছে। অন্যপাশে আরেকদল ধাঁধার খেলায় ব্যস্ত। মাঝে মধ্যেই তাদের অট্টহাসিতে মুখরিত হয়ে উঠছে চারপাশ। এ যেন এ দেশের নারীদের চিরচেনা বিনোদন। উকুন আনায় ব্যস্ত দলটিকে আমরা প্রশ্ন করি; কি করেন? সাথে সাথে উত্তর, 'ঢেলা বাছি'। একটি বাঁশের মাচায় আমরা আয়েশ করে বসি।

ধাঁধাকে কড়া ভাষায় বলে 'বান্তা'। অবাক হয়ে আমরা দেখি ধাঁধার খেলা।

এক পাশ থেকে বাবলী কড়া বলল, 'দাশটা মারাত রাগদেলকে, দুটা মারত পাকারকে মারকে'।

এর উত্তর বলতে পারল না কেউ। সবাই চুপ।

কেউ না পারায় বাবলীর মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল। হাসতে হাসতেই উত্তর দিল সে, 'ঢিলা বাছা'।

মানে উকুন আনা— দুই হাতের দশ আঙ্গুল থাকলেও উকুন মারা হয় দুই আঙ্গুল দিয়ে।

এবার বাবলী বলল আরেকটি ধাঁধা, 'ভুরুত পাংখি, একজন ডুবেলকে দুজন সাক্ষী'।

পাশ থেকে দলের মাহাতো জগেন বলল, এটি হচ্ছে সেচ দেয়ার জন্য টিন জাতীয় বালতি বিশেষের দুই দিকে দড়ি বেঁধে দুজন টেনে ধরা।

এবার মাহাতো বলল একটি ধাঁধা, 'ঘার হোত দুয়ার না খলে'

কেউ না পারায় মাহাতো বলে, এটি 'ডিমা' মানে ডিম। উত্তর শুনে সবাই হাসতে থাকে।

আসর বেশ জমে ওঠে। সুনিয়া কড়া গাইতে শুরু করে তাদের ভাষায় একটি গান–

'ইয়ারে ডিম চড়ওয়া ডিমা পার দে
নুনুক খনামে আগ লাগাল নুনু নিন্দারে দে'

গানের কথার অর্থ হচ্ছে এরকম : কোকিল পাখিকে ডাকা হচ্ছে, সে যেন তার ডিম পাড়া শেষ করে চলে আসে এই শিশুটির বিছানায়। আর তারপর তা দিয়ে গরম করে দেয়া বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে দেয় শিশুটিকে।

সুনিয়া আরো একটি গান ধরে।

'নিন্না নিন্নারে নুনু
মায়ে গেল সুইহা বোচল
দাদি কান্দা বুলো হে
বাপ গাড়ি মান'

অর্থ– ছোট বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়, তোর মা গেছে সুই বেচতে, দাদি কাঁদছে আর বাবা গেছে গাড়ি বাইতে।

এরকমভাবে চলতেই থাকে একের পর এক লোকাচার।

জগেনের সাথে কথা হয় ধান কাটার উৎসব নিয়ে। পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো কড়ারাও নবান্ন পালন করে ধুমধামের সাথে। কড়া ভাষায় এটি 'লবান'। প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসে প্রত্যেক পরিবারকে পৃথক পৃথকভাবে পালন করতে হয় 'লবান' অনুষ্ঠান। লবানের সময় এরা একে অপরকে বলতে থাকে, 'হামনি ঘার আইজ লবান'।

লবানে যে আরোয়া ধান (নতুন ধান) কাটতে যাবে সে উপোস অবস্থায় মাঠ থেকে কেটে আনে এক গোছা পাকা ধানের আগা। মাথায় করে ধানের গোছা নিয়ে বাড়িতে ঢোকার পূর্বেই বাড়ির মহিলারা তাকে প্রণাম করে উলুধ্বনি দিয়ে তার পা ধুয়ে দেয়। অতঃপর দূর্বা ঘাস, প্রদীপ আর ধূপ জ্বালিয়ে বরণ করে নেয় বাড়ির ভিতরে। এদের বিশ্বাস এভাবে ফসলরূপী দেবী লক্ষ্মীকে বরণ করা হয়। অতঃপর ধান থেকে চাল বের করে, ধূপ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে বাড়ির তুলসী দেবতাকে ভক্তি করে সেখানে

একটি মুরগি বলি দেয়া হয়। কড়া ভাষায় একে 'পিড়া ঘার' বলে। পরে বলি দেয়া মুরগির মাংসের সাথে নতুন চাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে উপোসকারী উপোস ভাঙে। তাছাড়া কড়ারা কিছু চাল বেটে গোটা বাড়িতে ছিটিয়ে দেয়। এদের বিশ্বাস এতে সারা বছরই খাদ্যের অভাব হবে না। কিন্তু কড়া গ্রামে এখন আর 'লবান' হয় না। নিজের জমি হারিয়ে অধিকাংশই আজ বর্গা চাষী। ফলে জমির সাথে সাথেই হারিয়ে যাচ্ছে কড়াদের 'লবান' উৎসবটিও।

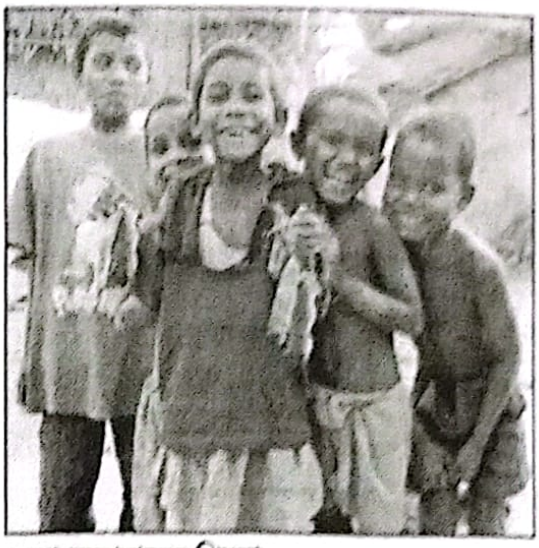
হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠে কথা বলতে বলতে উপস্থিত হয় উপল কড়া ও রঞ্জন কড়া। কড়া ভাষায় দুজনেই অভিযোগ জানায় মাহাতোর কাছে। উত্তেজিত হয়ে একজন আরেকজনের দিকে ছুঁড়ে দেয় কিছু শব্দ– বোকা খোকা, জুয়ান জারা, রারা। আমরা শব্দগুলোর কিছুই বুঝতে পারলাম না। পাশ থেকে কৃষ্ণ জানালো এগুলো কড়া ভাষায় গালি। নানা কথা বুঝিয়ে দুজনের ঝগড়া মেটালেন মাহাতো জগেন।

জগেনের হাতে কাঁকড়া চিহ্নিত কালচে সবুজ দাগ আমাদের নজরে পড়ে। জগেন জানলো এটি 'খোদনা'। একসময় এই চিহ্ন দিয়েই নাকি চেনা যেত কড়াদের। ছোটবেলাতেই কড়াদের হাত কেটে ঘা তৈরি করে দেয়া হতো এই চিহ্ন। চিহ্ন হিসেবে থাকতো 'কাঁকড়া ও বিছা'র প্রতিকৃতি। কিন্তু এখন এর প্রচলন নেই বললেই চলে।

কথার ছলে গোত্রের মাহাতো আপন মনেই বলতে থাকে তার বাবার মৃত্যুর কথা। জানায় জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে আদিবাসী কড়া সম্প্রদায়ের আচারগুলোও। গোত্রে কোনো নবজাতকের জন্মের পর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার নাম রাখা হয়। আবার কারো মৃত্যু হলে তার লাশ গোসল করিয়ে লম্বালম্বিভাবে সাদা কাপড় পরানো হয়। অতঃপর মাটির পাতিলে জ্বালানো আগুন রেখে পাতিলগুলো দেয়া হয় ১০ জনের হাতে। কোনো মন্ত্র পাঠ ছাড়াই লাশটিকে ১০ জনে নিয়ে যেতে থাকে কবরস্থানের দিকে। সবার সামনে থাকে গোত্রের মাহাতো। তার গলায় বাঁধা গামছায় থাকে খই আর সরিষা। বাড়ি থেকে লাশ নেয়ার সময় থেকেই মাহাতো খই আর সরিষা ছিটাতে থাকে।

কোনো বাঁশ ছাড়াই কড়ারা মৃত দেহ মাটিচাপা দেয়। কবরে মৃতের মাথা থাকে উত্তরে আর পা দক্ষিণে। এরা বিশ্বাস করে ৬ মাস পর্যন্ত মৃতের

আত্মা চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। তাই মৃতের বাড়িতে তার স্বজনেরা বিধান অনুসারে ৩দিন রান্নায় হলুদ ও লবণ ব্যবহার করে না। ৩দিন পরে বাড়িতে হয় 'তেলখের' অনুষ্ঠান। ঐদিন গ্রামে নাপিত এসে সবার চুল ও দাড়ি কামিয়ে দেয়। আর মেয়েদের কানি আঙ্গুলের নখ ব্লেড দিয়ে হালকাভাবে ঘষে দেয়া হয়। কড়াদের বিশ্বাস এতে গোটা গ্রামের শুদ্ধি ঘটে।


কড়া সম্প্রদায়ের শিশুরা

পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই নানা বিশ্বাস ঘিরে রেখেছে আদিবাসী কড়াদের জীবন। ভূমিকম্পের সময় কড়ারা বলে, 'ভূকম্প আয়ো হে'। তারা মনে করে লরিক নামক একটি শক্তিশালী জন্তুকে একটি কুয়োর পানিতে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। কুয়োটি বিশেষ ঢাকনা দিয়ে লাগানো এবং তার ওপরে পৃথিবী। লরিককে শান্ত রাখার জন্য পৃথিবী থেকে নালা দিয়ে গরুর রক্ত দেয়া হয়। রক্ত না দিলেই সে নাড়াচাড়া দিয়ে ওঠে। আর তখনই পৃথিবী কেঁপে ওঠে।

কৃষ্ণ কড়া জানালো সূর্যগ্রহণের সময় কড়ারা উপোস থাকে। গ্রহণের সময়টাতে এরা ধূপ জ্বালিয়ে, মাদল-ঢোল বাজিয়ে, বাড়ির চালে পানি ছিটায়। একই সাথে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'মামা, গাহানা ছাড়'! এরা মনে করে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় মানবজাতির দায়িত্ব তাঁদের বাঁচাতে চিৎকার করে ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করা।

কড়া সম্প্রদায়ে অবাধ মেলামেশায় কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশা ধরা পড়লে মাহাতো বা পাঁড়ে গড়াৎকে দিয়ে গোত্রের সবাইকে ডেকে বেটকি বা সভা করে। বেটকিতেই শাস্তি নির্ধারিত হয়। সাধারণত এ ধরনের অপরাধে ছেলের জুজুরী (লিঙ্গে) তে দড়ি বেঁধে লাঠি দিয়ে ডাং (টান দেয়া) দেয়া হয়। আর মেয়ের দুই হাত বেঁধে গায়ে পানি ঢেলে কুলা দিয়ে চারপাশ থেকে বাতাস দেয়া হয় ঠাণ্ডা লাগানোর জন্য।

হালজার কড়া গ্রামে দুজন মুক্তিযোদ্ধার দেখে মেলে। নাম থোপান কড়া আর সাতান কড়া। দুজনের কেউ আর এখন নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দেয় না। স্বাধীনের পরও তাদের মিলেনি কোনো কাগুজে সনদ। ১৯৭১-এর ৭ মার্চে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে উভয়েই উজ্জীবিত হয়। গোপনে আদিবাসীদের যুদ্ধে যাওয়ার প্রচারণা চালাতে থাকে তারা। কড়া ভাষায় বলতে থাকে, 'চালা দেশ স্বাধীন কারোওয়ে, সবইন মিলকে দেশ স্বাধীন কারোওয়ে'। যুদ্ধ শুরু হলে শিববাড়ি ইয়ুথ ক্যাম্পে ট্রেনিং নেন। ট্রেনিং শেষে ৭নং সেক্টরের অধীনে কমান্ডার ইদ্রিস আলীর নেতৃত্বে হামজাপুর ক্যাম্প থেকে হিলিসহ নিকটবর্তী গ্রামগুলোকে শত্রুমুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করেন তারা।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আদিবাসী-বাঙালি একসাথে যুদ্ধ করলেও স্বাধীনের পর পর সবকিছু বদলে যেতে থাকে। থোপান আক্ষেপ করে বলেন, 'যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম আর আমরা হয়ে গেলাম সংখ্যালঘু আদিবাসী সম্প্রদায়'। কার জন্য দেশ স্বাধীন করেছেন? এ রকম প্রশ্নে সাতানের উত্তর কড়া ভাষাতে— 'দেশ থেতুর হাম স্বাধীন করোইয়ে, হামার নিজের থেতুল স্বাধীন নাহি কারোইয়ে' (নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য স্বাধীনতা এনেছি)।

গল্প করতে করতেই চারদিকে সন্ধ্যা নামে। আমরা ফেরার প্রস্তুতি নিই। গোত্রের মাহাতো জগেন মলিনমুখে আমাদের বিদায় জানায়। বাংলাদেশে আদিবাসী কড়া সম্প্রদায়ের একমাত্র ও সর্বশেষ গোত্রের প্রধান তিনি। তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবি জগেন কি পারবে নিজ জাতিটিকে টিকিয়ে রাখতে?

যখন ফিরছি তখন চারদিকে অন্ধকার। চাঁদের সাথে আকাশে অজস্র তারা জ্বলজ্বল করছে। রাস্তার পাশে জোনাকির বাগান। স্নিগ্ধ চাঁদের আলো ভুলিয়ে দিচ্ছে অন্ধকারকে। দূর থেকে পিছন ফিরে দেখি কড়া গ্রামটিকে। একি! আকাশ থেকে জ্যোর্তিময় এক আলো যেন ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামটিতে।

মানবজমিন, ঈদ সংখ্যা ২০১০ ও সাপ্তাহিক, ২০০৯ এ ৩ কিস্তিতে প্রকাশ



বাহাপরব

শালবনের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তাটি চলে গেছে মহেশপুরের দিকে। মহেশপুরকে স্থানীয় সবাই জানে আদিবাসী গ্রাম হিসেবে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় দু'শতাধিক আদিবাসী পরিবারের বাস এ গ্রামে। বন্ধু দালু সরেনও থাকে এই মহেশপুরে।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দালুদের গ্রামে ধুমধামের সাথে পালিত হয় 'বাহাপরব'। সাঁওতালি ভাষায় 'বাহা' মানে 'ফুল' আর 'পরব' মানে 'অনুষ্ঠান' বা 'উৎসব'। অনেকেই এটিকে বসন্ত উৎসবও বলে থাকে।

দালুর কাছ থেকে বাহাপরবের গল্প শুনেছি বহুবার। গল্পের ছন্দে মনের পটে অন্য রকম এক ছবি একে রেখেছি বাহাপরবের। কিন্তু নানা কারণে যাওয়া হয়নি কখনো। এ বছর বাহাপরবের খবর পেতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি মহেশপুর যাওয়ার। বন্ধু মৃদুলও আগ্রহী হয়। আদিবাসী সাঁওতালদের বাহাপরব উৎসবের টানে ঢাকা থেকে এক রাতে মহেশপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই দুই বন্ধু।

দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলাতে মহেশপুর গ্রাম। ঢাকা থেকে হানিফ এন্টারপ্রাইজের সরাসরি বাসে চড়ে সকাল ৭টার মধ্যেই পৌঁছে যাই বোচাগঞ্জে। বাস কাউন্টারে অপেক্ষা করছিল দালু।

উপজেলার মধ্যেই বিখ্যাত ঘোষের মিষ্টির দোকান। সেখানে ভাজির সাথে গরম গরম লুচি পেয়ে আমরা তো হতবাক। খালি পেটে গোটা পাঁচেক লুচি চালান করে দেই নিমেষেই। নাস্তা সেরে একটি ভ্যানগাড়িতে রওনা হই মহেশপুরের দিকে।

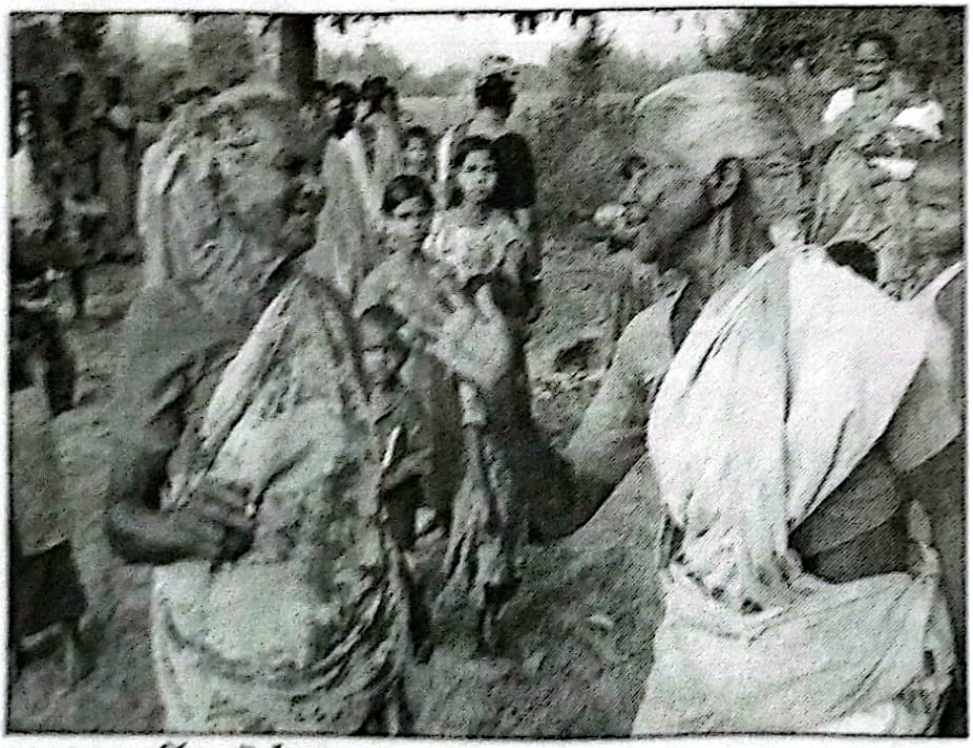
বোচাগঞ্জ থেকে মহেশপুরের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। পাকা রাস্তার পর শালবনের পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তায় এগুতে থাকি আমরা।

ভ্যানে বসেই দালুর সাথে চলে সাঁওতালদের নিয়ে নানা আলাপ। ভারতের সাঁওতাল পরগনার অধিকারী হিসেবে এই সম্প্রদায়ের

অধিবাসীরা বাস করতো বলেই নাকি এদের নাম হয়েছে সাঁওতাল। সাঁওতালদের বিশ্বাস একসময় তাদের আদি পিতা-মাতা ছিল। তাদের তখন পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি। তাদের ছিল সাত জোড়া সন্তান-সন্ততি। সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকেই তৈরি হয় ১২টি উপাধির। যেমন : মারডি, সরেন, কিস্কু, মুর্মু, হাঁসদা, টুডু, কেস্রা, হেমব্রম, বাস্কে, চোঁড়ে, পাঁওরিয়া ও বেদিয়া। সেমতেই তৈরি হয় ১২টি গোত্র। মুচকি হেসে দাদু জানায় সরেন গোত্রের সাঁওতাল হওয়ায় তার নাম হয়েছে দাদু সরেন।

আমরা তখন হত্তে দাদুর কথা শুনছিলাম। গ্রামের মেঠো পথে ভ্যানগাড়িটি ছুটে চলছে আপন গতিতে। রাস্তার পাশে একটি বড় বটগাছ। গাছটির দিকে তাকিয়ে আমরা অবাক হই। প্রায় শতাধিক বাদুর ঝুলে আছে গাছটিতে। উল্টো হয়ে ঘুমোচ্ছে তারা। মনে হচ্ছিল যেন এটি 'বাদুর কলগাছ'। খানিকটা পথ যেতেই মাটি আর ছনের তৈরি বিশেষ ঢঙের অদিবাসীদের ঘরগুলো আমাদের নজরে পড়ে। ঘরগুলোর অবয়বই বলে দেয় এটি অদিবাসী গ্রাম।

দাদু বলতে থাকে বাহাপরবের কথা। বসন্তে শাল, শিমুল, পলাশ, মহুয়া, চম্পা ফুল ফোটে চারদিকে। বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয় প্রকৃতি। বাহাপরব এর মধ্য দিয়ে সাঁওতাল মেয়েরা তাদের খোপায় রং-বেরঙের ফুল পড়ে। এর পূর্বে



বাহাপরবের ফুর্তিতে দুই সাঁওতাল বৃদ্ধা

অন্য ফুল ব্যবহার করতে পারে না। এটিই বাহাপরবের নিয়ম।

শালফুল ছাড়া বাহাপরব হয় না। শালফুলকে সাঁওতালরা বলে 'সারজম বাহার'। উৎসবটি তিনদিনের। প্রথম দিনের প্রধান অনুষ্ঠানের শুরুতে পূজার মাধ্যমে মুরগি বলি দেয়া হয়। উদ্দেশ্য জাহেরএরা, গোসাঁরএরা, মরেকু, তুরইকু নামক দেবতা বা বোঙ্গার সন্তুষ্টি লাভ। পূজার পরে মেয়েরা খোপায় শালফুলসহ বিভিন্ন রঙের ফুল পরে দলবেঁধে নেচে গেয়ে বরণ করে নেয় নতুন বসন্তকে। একইসাথে মাদল ঢোল বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিলি করা হয় শালফুল।



শালফুল দিয়ে পূজা করছেন এক সাঁওতাল

দ্বিতীয় দিন সাঁওতালরা একে অপরের গায়ে পানি ছিটায়। এরা বিশ্বাস করে এতে পুরনো সব হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা দূর হয়ে যায়। একে অপরের সাথে তৈরি হয় বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন। তৃতীয় দিন চলে শুধুই আনন্দ আসর।

কথা বলতে বলতেই আমরা পৌঁছে যাই মহেশপুরে। ক্লান্তিভাব কাটাতে খানিকটা বিশ্রাম নিই দালু সরেনের বাড়িতে। দুপুরের পর খানিকটা চাঙ্গা মনে চলে আসি বাহাপরব অনুষ্ঠানস্থলে।

গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে নির্জন বন আকৃতির জায়গায় চলছে বাহাপরব। সেখানে বোঙ্গার উদ্দেশ্যে উপোস অবস্থায় পূজা দিচ্ছেন গোত্রের জগ মাঝি 'বাঠু সরেন'।

একটি উঁচু জায়গায় তিনটি ধনুক দাঁড় করিয়ে তার মধ্যে রাখা আছে চাউল, সিঁদুর, ধান, দূর্বা ঘাস আর বেশকিছু শালফুল। পাশেই বলি দেয়া হয় বেশ কিছু মুরগি। আমরা অবাক হয়ে দেখছিলাম সবকিছু। হঠাৎ বাঠু সরেন মন্ত্র পড়তে থাকে— 'জোহার এবে খানদো, মরেকু তুরেকু, আলেয়া আতু নুতুমতে...'

পূজার পরেই রান্না হতে থাকে ভোজের খিচুরি। আশপাশের সাঁওতাল পাড়া থেকে দলবেঁধে আসতে থাকে আদিবাসীরা। বিকেলের মধ্যেই 'বাহাপরব উৎসবে' জড়ো হয়ে যায় হাজারখানিক সাঁওতালি।

আগতরা প্রত্যেকেই একে একে বাঠু সরেনের কাছ থেকে শালফুল গ্রহণ করে সেজদার ভঙ্গিতে ভক্তি করে। আমরাও সেভাবেই গ্রহণ করি নতুন বসন্তের শালফুলকে।

শালফুল গ্রহণের পরেই সাঁওতালরা মেতে ওঠে অন্যরকম এক আনন্দে। পুরুষেরা মাদল আর ঢোল বাজাতে থাকে। আর সেই তালে তালে খোপায় শালসহ নানা রঙের ফুল পড়ে বিশেষ ভঙ্গিতে মেয়েরা হাত ধরাধরি করে দলবেধে গাইতে থাকে—

'তোকয় কোকে চিয়ে লেদা বীর দিসাম দঃ,
তোকয় কোকে টান্ডি লেদা বীর দিসাম দঃ...'

(কে কে ওই জঙ্গলে গিয়েছিলো, কে কে ওই জঙ্গলটা পরিষ্কার করেছিলো...)

মাদলের তালে তালে আমরাও নাচতে থাকি আদিবাসী সাঁওতালদের সঙ্গে। দরিদ্রতার চাপে পড়া অবহেলিত আদিবাসীদের মলিনমুখগুলোও যেন মেতে উঠছে অন্যরকম এক আনন্দে। হঠাৎ পাশ থেকে সত্তর উর্ধ্ব বৃদ্ধা রাতনী সরেন আর অপনমই হাজদাও যোগ দেয় নৃত্যে। তাদের নাচার ভঙ্গি দেখে আমরাও মজে যাই।

সন্ধ্যার পর সবাই নেচে গেয়ে দলবেঁধে যেতে থাকে প্রত্যেক বাড়িতে। সেখানে নতুন বছরের শালফুল বিলি করা হয়। ফুল গ্রহণের পূর্বে বাড়ির লোকেরা বিতরণকারীর পা ধুয়ে দিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে যায়। শালফুল গ্রহণ করে তাকে ভক্তি করে বাড়ির লোকেরা। সাঁওতালদের বিশ্বাস ফুল রূপে দেবতা বা বোঙ্গাই তার ঘরে প্রবেশ করেছে।

ফুল বিতরণের পর গোটা গ্রামেই রাতভর চলে নাচ গান আর হাঁড়িয়া খাওয়া। মতপার্থক্যের বিভেদ ভুলে হাতে হাত ভেদে নাচতে থাকে সাঁওতালি মেয়েরা। তাদের আনন্দ উল্লাস আর বিশ্বাসের জোয়ারে ভেসে যায় সকল হিংসা, বিদ্বেষ আর শত্রুতা।

অন্যরকম আনন্দ নিয়ে যখন মহেশপুর থেকে বের হচ্ছি তখন চারদিকে নিঝুম অন্ধকার। অজস্র তারা উঠেছে আকাশে। রাত বাড়ার সাথে সাথেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মাদল আর ঢোলের মনমাতানো ছন্দ। বাড়ছে সাঁওতালি কণ্ঠগুলো। গোটা গ্রাম মেতে উঠছে বাহাপরবের ফুর্তিতে।

সাপ্তাহিক, ২ সেপ্টেম্বর ২০১০



এক মুক্তিযোদ্ধা আদিবাসীর খোঁজে

ডিসেম্বর। আনন্দ আর কান্নার বিজয়ের মাস। চারদিকে চলছে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন। এরই মধ্যে বের হয়েছি একজন অভিমানী মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে। দিনাজপুর শহর পেরোলেই চরপড়া পুনর্ভবা নদী। ব্যস্ত ব্রিজ থেকে এখন আর কেউ নদীর পানে তাকায় না। ব্রিজ পেরিয়ে খানিকটা পথ চলতেই বিরলের পথ।

উপজেলার নামটি কেন বিরল রাখা? সে বিষয়ে পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই স্থানীয়দের। ইতিহাস যদি কথা বলে তবে তা থেকে জানা যায় নানা ঐতিহাসিক তথ্য। সাঁওতাল বিদ্রোহেরও পূর্বে বিরলের গিরিডোবায় ঘটেছিল সাঁওতাল সর্দার পাঁড়ু রাজার বিদ্রোহ। পরবর্তীতে সাঁওতাল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলনসহ নানা বিদ্রোহ হয়েছিল এ অঞ্চলটিতে। এখানেই পাড়াভেদে বাস করে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাও, কড়া, তুরি, ভুনজার, মুশহরসহ নানা সম্প্রদায়ের আদিবাসী।

বিরল নিয়ে এরকম নানা গল্পে বিভোর হয়ে আমরা পাকা রাস্তা ধরে এগোতে থাকি। রাস্তার দু'ধারে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ। ধানকাটার পর মাঠে পড়ে আছে ধান গাছের ধূসর মোথা। দূরে কোনো গ্রাম্যবাজার থেকে ভেসে আসছে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন গানের ভাঙা ভাঙা সুর, 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে'। যেতে যেতে মাঝে মধ্যেই সাইড দিতে হচ্ছে ছোট ভট্‌ভট্‌িগুলোকে। সেগুলোতে পত্ পত্ করে উড়ছে লাল সবুজের পতাকা। ডিসেম্বর এ কারণেই সকলের পতাকা ওড়ানোর স্বাধীনতার মাস।

প্রায় আট কিলো পথ পেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম বিরল উপজেলা সদরে। নানা দলের রং চোঙ্গা বড় বড় ব্যানার ঝুলছে সবখানে।

দিনটি ছিল ১৪ ডিসেম্বর। বুদ্ধিজীবী দিবস। একই সাথে বিরল মুক্ত দিবস। নানা আয়োজনের টানটান ব্যস্ততা সবার মধ্যে। মুক্তিযোদ্ধাদের

সংবর্ধনা, মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতিচারণ আর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সরকারের নানা উদ্যোগের কথা জানবে বিরলবাসী।

কিন্তু এসব অনুষ্ঠানে সম্মানিত হওয়া কোনো মুক্তিযোদ্ধার কাছে কিন্তু আমরা যাচ্ছি না। আমরা খুঁজতে বের হয়েছি একজন মুক্তিযোদ্ধা আদিবাসীকে, যে আদিবাসী সম্প্রদায়টি স্বাধীনতার পর থেকে নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে এ দেশ থেকে। সম্প্রদায়টির নাম আদিবাসী 'কড়া'। গোটা দেশে কড়ারা টিকে আছে মাত্র ১৯টি পরিবার। তার মধ্যে ১৭টি বিরলে আর ২টি পরিবার রয়েছে দিনাজপুর সদরে।

১৯৭১-এ এই সম্প্রদায়ের এক যুবক বঙ্গবন্ধুর ডাকে উজ্জীবিত হয়ে অন্যান্য বাঙালির সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এখন আর তিনি নিজেকে পরিচয় দেন না। আদিবাসী এই মুক্তিযোদ্ধার নাম শতীশ কড়া। গ্রামের সবাই ডাকে সাতান কড়া নামে।

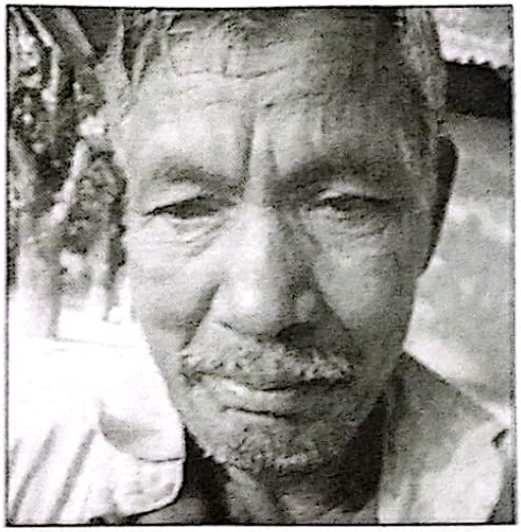
সাতান কড়াকে খুঁজতে আমরা বৈরাগি পাড়ার পথ ধরি। বিরল থেকে ভারাডাংগী হয়ে সোজা পথটি ঠেকেছে সীমান্তের কাটা তারের বেড়ার কাছাকাছি গিয়ে। ওপারে ভারতের কুসমণ্ডি থানা। আর এ পাশে বাংলাদেশ অংশে বৈরাগিপাড়া।

বিকেলের দিকে আমরা পৌঁছে যাই গ্রামটিতে। হাতে গোনা মাত্র দশ থেকে পনেরটি বাড়ি এ গ্রামে। কিন্তু সেখানে মুক্তিযোদ্ধা সাতান কড়ার কোনো বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল না। আমরা বেশ অবাক হই। কিন্তু হাল ছাড়ি না। লোকমুখে তথ্য নিয়ে সাতানের খোঁজ করতে থাকি।

বৈরাগিপাড়ার একেবারে শেষপ্রান্তে ছোট একটি দোকানে মুক্তিযোদ্ধা সাতান কড়ার দেখা মিলে। চলছেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কুষ্ঠরোগ তাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় তিনি গোপন করে যান। তার বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইলে, কোনো উত্তর মেলে না। মলিন মুখে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে। গ্রামের মানুষের দয়ায় এবাড়ি ওবাড়ি রাত কাটিয়ে দিন কাটছে ৬৫ বছর বয়স্ক এই মুক্তিযোদ্ধার। এ গ্রামের প্রতিটি বাড়িই আজ মুক্তিযোদ্ধা সাতান কড়ার নিজের বাড়ি।

দোকানে বসে চা খেতে খেতে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার নানা স্মৃতিচারণ চলে সাতানের সঙ্গে। রেডিওতে শোনা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সাতান কড়াকে প্রবলভাবে আবেগতাড়িত করে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আদিবাসী

পাড়ার যুবকদের সে বলতে থাকে, 'চালা দেশ স্বাধীন কারোওয়ে, সবইন মিলকে দেশ স্বাধীন করোওয়ে' (চল দেশ স্বাধীন করতে যুদ্ধে যাই, সবাই মিলে দেশ স্বাধীন করি)।


আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা সাতান কড়া

দেশকে শত্রুমুক্ত করতে নিজ জেলার ইদ্রিস আলী, মজিবর, নুরুল, দেবেন, বকুল, কাশেম বিসতী ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জাসেকসহ পরিচিত প্রায় ১১জন গোপনে সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধে যাওয়ার। বাবা, মা আর স্ত্রীকে ফেলে দেশের টানে গোপনে চলে যান মুক্তিযুদ্ধে। প্রথমে শিবরাড়ি ইয়ুথ ক্যাম্পে এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে শিলিগুড়ির পানিঘাটা থানায় ট্রেনিং নেন। ট্রেনিং শেষে চলে আসেন বড়গ্রাম ক্যাম্পে। ৭নং সেক্টরের অধীনে কমান্ডার ইদ্রিস আলীর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন হিলির নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে।

কার জন্য দেশ স্বাধীন করেছেন? জানতে চাইলে উত্তর মিলে 'কড়া' ভাষায়— 'দেশ থেতুর হাম স্বাধীন করোইয়ে, হামার নিজের থেতুল স্বাধীন নাহি কারোইয়ে' (নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য স্বাধীনতা এনেছি)।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বার বার সাতানের চোখ ভিজে যায়। যুদ্ধের সময়ে হানাদার আর রাজাকারদের অত্যাচারের কথা শুনে কতদিন নিজের পরিবারের জন্য ঘুমের মধ্যেই আঁৎকে উঠেছে সাতান। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তখন এদেশের প্রতিটি পরিবারই ছিল নিজের পরিবার। দেশের জন্য, দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সাতানকে অনাহারে বহুরাত কাটাতে হয়েছে গোরস্থানে।

যুদ্ধ করতে গিয়ে একবার সাতানের মাথায় ভিদে যায় গেনেডের স্পি-স্টার। যুদ্ধের শেষের দিকে মুক্ত এলাকা ছাড়ার আগে হানাদাররা টিউবওয়েলগুলোতে বিষ ঢেলে রাখতো। সে টিউবওয়েলের পানি খেয়ে কত সহযোদ্ধার মৃত্যু যন্ত্রণা কাছ থেকে দেখেছে এই মুক্তিযোদ্ধা। সে সব স্মৃতি আজো সাতানের মনে ঝড় তোলে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা একত্রিত হয় দিনাজপুর স্টেডিয়ামে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার রশিদ। সকলের সাথে অস্ত্র জমা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সাতান কড়া ফিরে যায় পূর্বপুরুষদের কৃষি পেশায়।

স্বাধীনের পর মুক্তিযোদ্ধা সনদ নেয়ার বিষয়টি জানলেও এর প্রক্রিয়া বিষয়ে কিছুই জানতেন না তিনি। তা ছাড়া সনদপত্রের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ধরণা দেয়ার মতো নূন্যতম খরচটুকুও তার ছিল না। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেক দৃষ্টিও পড়েনি তার ওপর। ফলে মুক্তিযোদ্ধা হয়েও মিলেনি কোনো কাগুজে সনদ। কিন্তু এ নিয়ে তার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই। সাতান বলে, 'যুদ্ধ করেছি বঙ্গবন্ধুর ডাকে, দেশ স্বাধীন করেছি— মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এর থেকে আর বড় কি পাওয়ার আছে'।

২৫ বছর আগে জমি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় স্থানীয় এক প্রভাবশালীর সাথে। সে সময় হুমকির মুখে ভারতে চলে যায় সাতানের ছেলেমেয়েসহ পরিবারের অন্যরা। কিন্তু সাতান থেকে যায় তার এই প্রিয় দেশটিতে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিদের কাঁধে কাঁধ রেখে যুদ্ধ করে এ দেশকে স্বাধীন করেছেন যে আদিবাসী যুবক। মাটির টানে এ দেশে পড়ে আছেন যে মুক্তিযোদ্ধা। সংখ্যালঘু আদিবাসী হওয়ায় নিজের জমি থাকতেও সে আজ নিজ দেশে পরবাসী।

কারো কাছে হাতপাততে মুক্তিযোদ্ধা সাতান কড়ার ঘোর আপত্তি। তাই পঙ্গু হয়েও অন্যের জমিতে নিড়ানোর মতো হালকা কাজ করে যা উপার্জন করেন তা দিয়েই কোনো রকমে চলছে তার জীবন।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোনো সুবিধা লাভ নয় বরং তার সাফ কথা, 'দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি, সুবিধার কথা চিন্তা করে নয়। শুধু চাই স্বাধীন দেশে আদিবাসী হিসেবে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে।' কিন্তু সাতান কড়াদের মতো মুক্তিযোদ্ধারা ব্যথিত হন যখন দেখেন অমুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকাররাও কাগুজে সনদের জাদুতে মুক্তিযোদ্ধা সেজে বসে আছেন।

স্বাধীনের পরে পাওয়া দেশকে নিয়ে কোনো আক্ষেপ বা কষ্ট আছে কিনা? জানতে চাইলে অভিমানী এই মুক্তিযোদ্ধা অঝরে কাঁদতে থাকেন। চোখ মুছতে মুছতে বলেন, 'যার ডাকে যুদ্ধ করলাম তাকে তো স্বাধীন

দেশেই বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না, তার পরিবারের সকলকেই হত্যা করা হলো, এটাই দুঃখ।'

মুক্তিযোদ্ধা আদিবাসী সাতানের সাথে যতই কথা বলছিলাম ততই তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হচ্ছিল। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে বলতে তিনি ছোট শিশুর মতো কেঁদে উঠছিলেন। দেশের জন্য যে যুদ্ধ করল, দেশে থাকার জেদের কারণে যাকে পরিবারের প্রিয় মানুষগুলো ছেড়ে চলে গেল। সে আজ নিজ দেশেই পরবাসী। মুক্তিযুদ্ধের সনদপত্র না থাকায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার নেই কোনো সম্মান। অথচ পঙ্গু হওয়ায় পাচ্ছেন সরকারের প্রতিবন্ধী ভাতা।

সরকার পরিবর্তনের পর পরই পরিবর্তিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা। সে সুযোগে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সনদপত্র পায় অমুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারেরাও। ফলে স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরও নানা দলে বিভক্ত জাতির সূর্যসন্তান মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযুদ্ধের এতবছর পরেও এ দেশে পাওয়া যায় সাতান কড়ার মতো নিভৃত, ত্যাগী ও অভিমানী মুক্তিযোদ্ধাদের। যাদের কোনো কাগুজে সনদপত্র নেই। আছে শুধু দেশের জন্য বুকভরা ভালোবাসা।

আমরা কি পারি না সাতান কড়াদের মতো মুক্তিযোদ্ধা আদিবাসীদের খুঁজে বের করতে। তাদের সম্মানিত করতে। স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের নূন্যতম অধিকারটুকু পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে। ৬৫ বছর বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধা সাতান কড়া যখন মারা যাবে সনদপত্র না থাকায় তখন মিলবে না কোনো রাষ্ট্রীয় সম্মান। কিন্তু তাতে সবহারা এই মুক্তিযোদ্ধা আদিবাসীর কি এসে যাবে! বরং লজ্জিত হতে হবে এ দেশকে, এ জাতিকে।

সাপ্তাহিক, ০৫ আগস্ট ২০১০

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সমিতি লিমিটেড
গ্রন্থাগার
রাঙ্গামাটি

ভাষা হারানোর শঙ্কায় আদিবাসী মাহালিরা

শহরের মধ্যেই কোনো আদিবাসী গ্রাম থাকতে পারে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আদিবাসী নামটি মনে আসতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে পাখিডাকা সবুজ বন, মুক্ত, লোকালয়হীন এক স্বপ্নময় সুখী মানুষদের গ্রামের ছবি। নাম শুনলেই মাদল, ঢোল, মন্দিরা আর দলবেঁধে নাচতে থাকা মেয়েদের নূপুরের শব্দ বেজে ওঠে মনে। কিন্তু সেসব কিছু নেই এই গ্রামটিতে। শব্দ করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আদিবাসী সম্প্রদায়টির কথা জানায় পুলকবাবু।

দিনাজপুর ডিসি অফিসের সামনেই বিশাল বড় একটি খোলা মাঠ। সবাই জানে বড় মাঠ হিসেবে। অনেকেরই ধারণা গোটা রাজশাহী বিভাগের মধ্যে অন্যকোনো শহরে এমন বড় মাঠ নেই। শীত মৌসুমে মাঠের একাংশ জুড়ে চলে মেলাসহ নানা আয়োজন। অন্য অংশে সারা বছরই চলে তরুণ ও যুবকদের খেলাধুলা।

এ জেলাতেই বহু পূর্ব থেকে বাস করছে নানা আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো। সাঁওতাল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলনসহ নানা আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত ছিল এ আদিবাসীরা। আদিবাসী মানেই একটি সভ্যতা, একটি ভাষা আর অন্যরকম আদি সংস্কৃতি। সে হিসেবে দিনাজপুরবাসীরা নিশ্চয়ই গর্বিত। এ রকম নানা চিন্তা করতে করতেই পৌঁছে গেলাম শহরের দক্ষিণে বড় মাঠের শেষপ্রান্তের কসবা মিশন এলাকায়।

একদিকে একটি বড় গির্জা আর অন্যদিকে একটি ছোট্ট মসজিদ। এর মাঝ দিয়ে ঢালুতে নেমে গেছে সরু একটি পথ। খানিক যেতেই দেখা গেল ছোট্ট মাঠের মধ্যে কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ বাঁশ দিয়ে তৈরি করছে নানা জিনিস। সারা মাঠেই এলোমেলোভাবে পড়ে আছে বাঁশের নানা খণ্ডাংশ। দুজন মহিলা বাঁশ দিয়ে আপন মনে বুনে যাচ্ছে বড় বড় ঝুড়ি। অন্য দিকে

খেয়াল নেই তাদের। শিল্পী যেন আপন মনেই ডুবে রয়েছে তার শিল্পকর্মে। এক যুবতীর নাম জানা গেল স্বপ্না কিসকু। নামের টাইটেল শুনে তারা সাঁওতাল কিনা জানতে চাইলে, স্বপ্না ভুল ভাঙায়, মাহালি ভাষায় বলে, 'আলেদো মাহালে কালালে' অর্থাৎ আমরা আদিবাসী মাহালি সম্প্রদায়।

এখানে রয়েছে আদিবাসী মাহালি সম্প্রদায়ের প্রায় ২৫টি পরিবার। এদের প্রত্যেকেই তাদের বাপ-দাদার আমল থেকে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। প্রত্যেকেরই জন্ম হয়েছে মাহালি খ্রিস্টান পরিবারে। আর তাই আদিবাসী হিসেবে সনাতন ধর্মভিত্তিক নানা উৎসব আর সংস্কৃতিগুলো দিনে দিনে হারিয়ে গেছে তাদের জীবন থেকে।

একটি বাড়িতে ঢুকতেই ৭০ বছর বয়স্ক দাও হাজদাকে দেখা গেল বাড়ির উঠানে বসে বড় বড় বাঁশের টুকরি তৈরি করছে। উঠানের অন্য পাশে বসে আছে ১০০ উর্ধ্ব বৃদ্ধা জুলিয়া হেমব্রন। বয়সের ভারে কানে না শোনায় আমাদের দিকে অবাক দৃষ্টিতে শুধুই তাকিয়ে থাকে। জুলিয়া এখন বেঁচে আছে শুধুই কালের সাক্ষী হয়ে। দাও হাজদা থেকে জানা যায় আদিবাসী মাহালিরা তাদের নামের শেষে ৭টির মতো টাইটেল ব্যবহার



বাঁশের কাজ করছে এক মাহালি নারী

করে। হেমব্রন, মুরমু, কিসকু, হাজদা, মারডি প্রভৃতি। এদের এক টাইটেলের ছেলেমেয়েদের মাঝে বিয়ে নিষিদ্ধ। মাহালিরা মনে করে এদের এক টাইটেলের পূর্বপুরুষ একজন। তাই এক টাইটেলের ছেলেমেয়েদের রক্ত একই। বাইরে থেকে দাও হাজদার সামনে কিছু বাঁশের অংশ এনে ফেলল তার স্ত্রী ফিলোমিনা মারডি। সে জানালো মাহালিদের পেশার কথা। পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই আদিবাসী মাহালিরা বাঁশের কাজের সাথে যুক্ত। কিনে আনা মাকলা বাঁশ কেটে প্রথম দিন মাহালিরা ছোট সাইজ করে বিড়াই তৈরি করে। এটিকে 'বিতি' বলে। এরপর এই বিড়াই থেকেই তৈরি করা হয় বাঁশের ধামা (ঢালি), টুপলা (বাঁশের তৈরি ছোট বাটি বিশেষ), চেঙ্গারী, বিনী, হাটা (কুলা), টুকরি প্রভৃতি। দাও হাজদা জানায় এ কাজে স্বাধীনতা আছে হয়তো এ কারণেই তাদের পূর্বপুরুষরা এ পেশায় যুক্ত ছিল। আর বাপ-দাদাদের পেশা হওয়ায় তারাও ধরে রেখেছে বাঁশের কাজকে।

সাঁওতালদের মতো মাহালিরা তাদের গোত্রের প্রধানকে ডাকে মাঝি হারাম বা মহত বলে। এছাড়াও রয়েছে জগ মাঝি ও গডেত। সনাতন ধর্ম মতে মহতকে গোত্রের প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু মাহালিরা ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হওয়ায় নিজেদের ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা ছাড়া মহতের এখন আর তেমন কোনো দায়িত্ব নেই।

গোত্রের মহত আব্রাহাম হাজদা জানালো তাদের পূর্বপুরুষরা এসেছে ভারতের দুমকা থেকে। এক সময়ে এক মহাল থেকে অন্য মহালে ঘুরে বেড়াতো বলেই আদিবাসী এই সম্প্রদায়টির নাম হয়েছে মাহালি।

খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের পর থেকেই মাহালি জাতির ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতি, বিশ্বাস, আচার ও ঐতিহ্য আজ অবলুপ্ত প্রায়। আদিবাসী মাহালিরা হারিয়ে যাচ্ছে অন্য একটি জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মাঝে। মহত জানায় তাদের ছেলেমেয়েরা বেড়ে উঠছে খ্রিস্টান হিসেবে, আদিবাসী মাহালি হিসেবে নয়। আবার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কাছেও থাকছেনা তাদের সম্মানটুকু। খ্রিস্টানদের কাছে তারা শুধুই আদিবাসী।

ধর্মান্তরিত হলেও আদি কিছু বিশ্বাস এখনো রয়েছে মাহালিদের মাঝে। গোত্রের মহত জানায় বাড়িতে কারো বমি বা পেটের ব্যাধি হলে

মাহালিরা বলে 'হই নাম করকে' অর্থাৎ বাতাসে পেয়েছে। আর এই বাতাস থেকে মুক্তি পেতে তখন ডাকা হয় 'জান গুরু' বা ওঝাকে। অধিকাংশ ওঝাই এখন হাতুড়ে ফলে রোগীর অবস্থা বেশি খারাপ হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় এরা।

মাহালি সম্প্রদায়ে নবজাতকের জন্মের ৯ বা ১১ দিনের দিন যখন নাভী পড়ে ঐ দিন পালন করতে হয় বিশেষ ধরনের আচার। মাহালি ভাষায় এই দিনটিকে বলে 'কামানী'। ঐ দিন বাড়িতে ডাকা হয় নাপিতকে। নাপিত এসে গোত্রের পুরুষদের চুল ও দাড়ি কামিয়ে দেয় আর মেয়েদের কানি আঙ্গুলের নখ ঘষে দেয় ক্ষুর বা ব্লেড দিয়ে। মাহালিদের বিশ্বাস এতে গোত্রের সবার শুদ্ধি ঘটে। এছাড়াও মাহালিরা নবজাতকের নামকরণের অনুষ্ঠানকে বলে 'বাত্তিশ মা'। এদের যে কোনো অনুষ্ঠানে চলে চুয়ানি আর হাঁড়িয়া খাওয়া।

দাও হাজদা জানায় পূর্বে বাঁশের কাজের পাশাপাশি কেউ কেউ কৃষির সাথে যুক্তছিল। তাই অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম ফসল কাটার দিন অন্যান্য আদিবাসীদের মতোই এরাও পালন করে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। মাহালি বাসায় এটি 'নবান'। এদিন নতুন চালের ভাতের সাথে রান্না করা হয় নয় পদের তরকারি। নবান্ন উৎসবের কোনো গান আছে কিনা জানতে চাইলে দাও হাজদা বলে, 'মাহালি ভাসাতে কোনো শিরিন বানোয়া' অর্থাৎ মাহালি ভাষায় কোনো গান হয় না।

মাহালি গ্রামের একটি ঘরে দুটি বাচ্চা নিয়ে বসে থাকতে দেখা গেল জয়নিকা হেমব্রনকে। বাচ্চারা লেখাপড়া করে কিনা জানতে চাইলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়নিকার বলে, 'অভাব, বাচ্চাদের পড়াতে পারি না'। সে জানালো খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণকারী মাহালি সম্প্রদায় এক সময় নানা সুবিধা পেলেও বিদেশি সাহেবরা চলে যাওয়ায় এখন মিশন থেকে তেমন সহযোগিতা পায় না। একটি বাঁশ দিয়ে দুই দিনে ১৫টি ঝুড়ি তৈরি করে তা ২৫/- দরে বিক্রি করে যে লাভ হয় তা দিয়েই কোনো রকমে চলছে মাহালি পরিবারগুলো।

এ দেশের আদিবাসী মাহালিরা হারিয়ে ফেলছে তাদের মায়ের ভাষাটুকু। বর্তমানে এ গ্রামের মাহালি ছেলেমেয়েরা বলতে পারে না তাদের নিজেদের মাহালি ভাষা। এ নিয়ে প্রতিটি পরিবারের বড়দের মনে নানা

কষ্টের খেলা চলে। যে ভাষায় মাহালি মায়েরা গল্প শোনাতো তারই প্রিয় সন্তানটিকে। সে ভাষা আজ হারাতে বসেছে তারা। ফিলোমিনা বলে, 'নিতো মাহালি ভাষা লয় বান দায়েক উ' অর্থাৎ মাহালি ভাষা টিকিয়ে রাখা খুবই জরুরি। কষ্টবোধ নিয়ে গোত্রের মহত বলে, 'মাহালি ভাষা টিকোরা চেষ্টা হইও' অর্থাৎ মাহালি ভাষা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা উচিত।

একটি জাতির মাতৃভাষা হারানোর কষ্টবোধ নিয়ে ফিরছি মাহালি গ্রাম থেকে। এই সভ্যতায় নিজেকে যে সভ্য ভাবছি তার জন্য মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাই আদিবাসী মানুষগুলোকে। একটি জাতি মানে একটি সভ্যতা। একটি ইতিহাস। বাঙালি জাতি একসময় নিজের মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মাতৃভাষা। কিন্তু স্বীকৃতি কি পেয়েছে আদিবাসীদের ভাষাগুলো। আমরা কি পারি না তাদের ভাষাগুলোকে মর্যাদা দিতে। হয়তো পারি। পারা না পারার দোলায় শহরের কোলাহলে মন থেকে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায় আদিবাসী মাহালিদের মুখগুলো।

সাপ্তাহিক, ১৪ জানুয়ারি ২০১০

হামনি ওরাও জাতি

দিনাজপুর শহরের প্রবেশমুখেই লোকভর্তি বেশ কয়েকটি ঢাকাগামী ট্রাক। যাত্রীদের চোখেমুখে বিষন্নতার ছাপ। সকলেরই বোগলের নিজে একটি বড় পুটলি বিশেষ। ধরার কায়দাই বলে দেয় এটিই তাদের শেষ অবলম্বন। কোথায় যাচ্ছে এরা? কোনো সমাবেশ যাত্রা নয়তো। এক বৃদ্ধ জানালো তাদের গন্তব্য রাজধানী ঢাকা।

ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই তিন মাস এ অঞ্চলের হতদরিদ্র লোকেরা কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয় ঢাকায়। রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার মতো দিনাজপুর হতে ঢাকামুখী যাত্রীর সংখ্যা কম হলেও এখানে ভূমিহীন চাষীদের সংখ্যা কম নয়। ফলে শত শত লোক এ সময়ে বেড়িয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। এ বছর দেরিতে বৃষ্টি হওয়ায় কৃষকদের জমি তৈরি ও ফসল লাগানোর কাজও শেষ হয় অনেক দেরিতে। আর এই পরিবর্তিত আবহাওয়ার সাথেই পরিবর্তিত হয় এদের ঢাকা যাত্রা। আবহাওয়ার সাথে সাথেই পরিবর্তিত হচ্ছে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনের গতিধারা। প্রখ্যাত আলোকচিত্রী মনিরুল আলম তার প্রকাশিত আলোকচিত্রে ঢাকামুখী এসব মানুষকে বলছেন জলবায়ু শরণার্থী।

ট্রাকযাত্রীদের সকলেই বাঙালি, কোনো আদিবাসীর মুখ চোখে পড়ল না। এরা কেউ চাষী, কেউবা জেলে অথবা অন্য কোনো পেশার। দিনাজপুর শহরকে ঘিরে রেখেছে পুনর্ভবা নদী। একসময় এই নদীকে ঘিরেই বেঁচে ছিল শত শত পরিবার। আজ তা শুকিয়ে মাঠ হয়ে গিয়েছে। আর নদীর মতোই শুকিয়ে গেছে নদীপাড়ের মানুষদের জীবন।

জেলা শহর পেরিয়ে আমরা ছুটছি বিরলের দিকে। যতই এগুচ্ছি ততই যেন সবুজের সজীবতায় ঘিরে ধরছে। প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতেই বিরল উপজেলা সদর চলে আসি আমরা। আমাদের গন্তব্য বহবলদিঘি।

সে উদ্দেশ্যেই চলছি একটি পাকা রাস্তা ধরে। রাস্তার দুইপাশের সবুজ গাছগুলো বেশ লম্বা ও পুরনো। চোখের সীমানায় শুধুই সবুজ ধানক্ষেত। কিছুদূর যেতেই কানে ভেসে আসলো শিশুদের কণ্ঠে আরবি পাঠের চমৎকার সুর। রাস্তার পাশের একটি মক্তবের ভাঙাচোরা সাইনবোর্ড দেখে বুঝে যাই আমরা বহবলদিঘিতে পৌঁছে গেছি।

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকসকল পরস্পরের সাথে কথা বলছে অপরিচিত কোনো ভাষায়। পাকা রাস্তার দুই পাশে একই ভাষাভাষি আদিবাসীদের দুটি গ্রাম। একটি গ্রামের বাড়িগুলো বেশ বড় ও পরিপাটি। স্বচ্ছলতার ছাপ পড়েছে পুরোপুরি। আর অন্য গ্রামটি কিছুটা বিবর্ণ। মাটির ঘরগুলো বেশ পুরনো ও ভাঙাচোরা। তবুও বাড়ির শোভা বাড়াচ্ছে উঠানে লাগানো তুলসি গাছটি। বড় পাকুর গাছের ছায়ায় বসে আরাম করছিল এক বৃদ্ধ। নাম জানালো টেম্পু টিগ্‌গা। টিগ্‌গা কোনো সম্প্রদায়ের টাইটেল- এই নিয়ে যখন মাথা ঘামাচ্ছি, তখনই সে বলল, 'হামনি ওরাও জাতি'।

দুটি গ্রামেই আদিবাসী ওরাও সম্প্রদায়ের বাস হলেও স্বচ্ছল গ্রামটির সকলেই ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হয়েছে। কিন্তু অপর গ্রামটির ওরাওরা নানা প্রলোভনকে উপেক্ষা করে টিকিয়ে রেখেছে চৌদ্দ পুরুষের সনাতন ধর্মকে। টেম্পু টিগ্‌গা থেকে জানা যায় ওরাও সম্প্রদায়ে নামের টাইটেল চৌদ্দটির মতো। এদের এক টাইটেলের ছেলেমেয়ের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ।

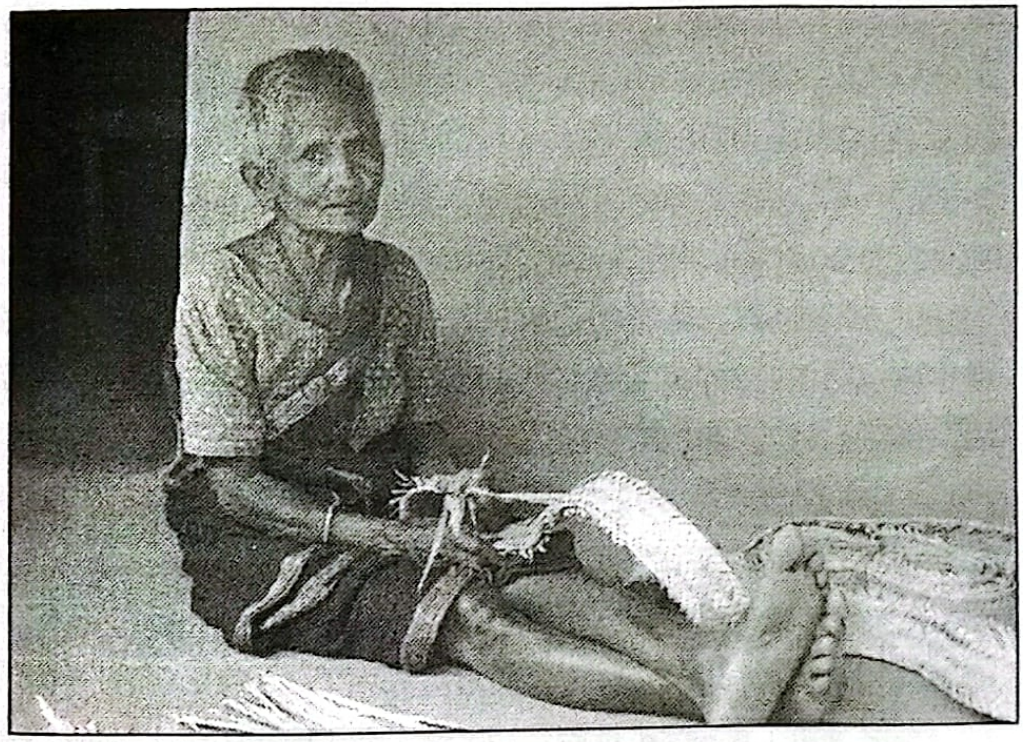
এখানের ওরাওরা তাদের গোত্রপ্রধানকে ডাকে 'মহত' বলে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতোই গোত্রের মহতকে পালন করতে হয় নানা দায়িত্ব। একটি বাড়ির মধ্য থেকে ওরাও ভাষায় টেম্পুর সাথে কথা বলছিল ফুল টিগ্‌গা। তাদের কথার কিছুই বোঝা গেল না। ফুল জানালো এ দেশে আদিবাসী ওরাওরা ২টি নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। একটি 'কুরুক' অপরটি 'সাদরি' ভাষা। কারো নাম জানতে আদিবাসী ওরাওরা কুরুক ভাষায় বলে, 'নিংগা য়ে নামে ত্রন্দা' আবার সাদরি ভাষায় বলে 'তোর নাম কা'। কবে থেকে এ গ্রামে? এরকম প্রশ্নে মাঝ বয়সী দুলালী টপপো বলে, 'মোর বাবা মায়ে ঢের দিন ছে হান'। জানা গেল, সীমাহীন দরিদ্রতা আর ধর্ম রক্ষার সংগ্রামের মাঝেই বেঁচে আছে এখানকার আদিবাসী ওরাওরা।

চারপাশের গ্রামগুলোতে পুরোদমে চলছে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি। কিন্তু দেবী দুর্গার প্রভাব ওরাওদের মধ্যে নেই বললেই চলে। টেম্পু জানালো

এরা কারমা পূজা করে ধুমধামের সাথে। পূজার সময় ঘনিয়ে আসতেই ওরাওরা গাইতে থাকে 'কারমাকা দিনে পানি না বারেছে, চাইরো পানি ছলে মনে দরেসাই'। কড়া সম্প্রদায়ের মতোই ওরাওরা কারমা পূজার চারদিন আগে বাঁশের ডালায় কলাপাতা বিছিয়ে সেখানে মাটি ও বালি দিয়ে কালাইয়ের বীজ লাগায় ও ভগবানের নামে উপোস করে। মূলত যে কয়জন উপোস থাকে সেই কয়টি বীজ লাগানো হয়। একই সাথে ডালায় ছোট ছোট কাঠি গেড়ে উপোসকারীর সংখ্যা স্মরণ রাখা হয়। পূর্বপুরুষদের বিধান মতে উপোসকারী মহিলা হলে ছোট ডালে সিঁদুর আর পুরুষ হলে লাগানো হয় কাজল। চারদিন পর ডালায় বীজ থেকে চারা জন্মায়। ওরাওদের বিশ্বাস যাদের লাগানো বীজ থেকে চারা হয় না তাদের উপোস সঠিক হয়নি এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসও দুর্বল।

কারমা পূজা ছাড়াও ওরাও সম্প্রদায়ের মধ্যে সাহরাই পূজার প্রচলন রয়েছে। ফুল টিগ্গা জানায়, প্রতিবছর আশ্বিনের চাঁদের অমাবস্যার পরের দিন গ্রামের প্রত্যেকের বাড়িতে আলাদা আলাদাভাবে পালন হয় 'সাহরাই পূজা'।

নিয়মানুসারে বাড়ির সাথে লাগানো গোয়াল ঘরে এই পূজা পালন করা হয়। ঐদিন গোয়াল ঘর মাটি দিয়ে লেপে পরিষ্কার করে শালবন থেকে



এক ওরাও বৃদ্ধা

আনা উঁইয়ের ঢিবির মাটি এনে তিনভাগে উঁচু করে রাখা হয়। মেঝেতে রাখা হয় সিঁদুর, বেলপাতা, কলাপাতা, দূর্বাঘাস, আতপ চাল, জবা ফুল ও ধূপ। অতঃপর সেখানে মুরগি বলি দিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে পূজা করে ওরাওরা। পূজা শেষে প্রথমেই গরু-ছাগলকে খাওয়ানো হয় লবণ ও হলুদ ছাড়া কালাই। গরু-ছাগলের খাওয়ার পরই নিয়ম অনুসারে বাড়ির সকলকে ঐ গোয়াল ঘরে বসেই সেরে নিতে হয় খাওয়া-দাওয়া। রাতভর চলে হাঁড়িয়া খাওয়া ও আদিবাসী নাচ।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতোই ওরাওদের মধ্যেও 'নাদ'(ভূতে)র বিশ্বাস রয়েছে। এরা ভূত তাড়ানোর ওঝাকে ডাকে 'মাহান' বলে। বাড়িতে কারো কোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা হলেই ওরাওরা বলতে থাকে, 'আসিল নাদ ধারেচ কিরি।' তখন এরা ভগবানের উদ্দেশ্যে পূজা দেয়, মানত করে। তাছাড়া ভূত তাড়াতে ডেকে আনে মাহানকে।

এ ওরাও গ্রামটির সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা মুংগলী টিরকী। বয়স শতোর্ধ্ব। শরীরে বয়সের কিছু ছাপ ছাড়া কাজকর্মে বেশ বলিষ্ঠ। প্রকৃতির মতো শক্তি নিয়ে স্বাভাবিক সাংসারিক কাজ করছে সে। দুপুরের রান্না চলছে। রান্না হচ্ছে 'বিমাই' (ঝিনুক)। পরিবারের সবাই আজ বিমাই দিয়ে ভাত খাবে, সে আনন্দ সবার চোখেমুখে। বিমাই ছাড়াও মুংগলীর ভাষায় অন্যান্য ওরাওদের মতোই তার পছন্দ বিজু, খাটাস, বানডো (বনবিড়াল), চিকলা (বড় শিয়াল), খড়খড়া (খেক শিয়াল), অশকা বা মুসা (ইঁদুর), খেড়া (খরগোশ), ঘুংগি (শামুক) ও কাঁকড়ো। কাঁপা কাঁপা গলায় মুংগলী জানালো, এই গ্রামেই এক সময় ধুমধামের সাথে বিয়ে হয়েছিল তার। অনেক পিছনের স্মৃতি মনে করতেই বেরিয়ে আসে নানা অজানা কাহিনী।

এই বহবলদিঘিতেই এক সময় কোনো বাঙালির অস্তিত্ব ছিল না। ছিল নানা সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা। আদিবাসীদের নিজস্ব জমি ছিল। ছিল প্রকৃতিনির্ভর অন্য রকম আনন্দ। সবাই ছিল সনাতন ধর্মের। ফলে প্রায় সারা বছরই কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের পূজা চলতো এখানে। রাতে আদিবাসী গ্রামগুলোতে শোনা যেত ছন্দময় মাদল আর ঢোলের শব্দ। মুংগলী দুঃখ করে বলতে থাকে, এখন এ দেশে আদিবাসী ওরাওরা বেঁচে আছে নানা দুঃখ কষ্টে। তাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে বেঁচে থাকা আর সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য। অভাবের কারণে গোত্রের মহতসহ ১০টি পরিবার অল্প

কিছুদিন আগে দীক্ষা নিয়েছে বৌদ্ধ ধর্মে। ফলে এই গ্রামটি এখন মহত শূন্য।

শংকর টিগ্‌গা থেকে জানা যায় ওরাওদের শিকারের কথা। বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে এখানকার ওরাওরা তীর-ধনুক নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে পাশের শালবনে। এরা বিশ্বাস করে শিকারের জন্য বনে ঢোকার আগে 'বাঘমন্ত্রী' কে পূজা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হয়। তা না হলে শিকার তো মিলবেই না বরং পড়তে হবে জীবন হারানোর মতো বিপদে। এ কারণেই এরা বনে ঢোকার আগে মাটিতে তীর-ধনুক রেখে, জল ছিটিয়ে দূর্বাঘাস ও আতপ চাউল রেখে ধূপ জ্বালিয়ে বাঘমন্ত্রীকে খুশি করার জন্য পূজা করে।

ওরাওদের গ্রাম থেকে ফেরার পথে ভাবছি মুংগলীর কথাগুলো। তীব্র দারিদ্রতা আর নিজেকে ধর্মান্তরিত না করার নীরব সংগ্রামে লিপ্ত এ দেশের ওরাওরা। তারা কি পারবে পূর্বপুরুষদের ধর্মকে টিকিয়ে রাখতে। নাকি পুনর্ভবা নদীর মতোই মাটিচাপা পড়ে যাবে তাদের প্রাণের সনাতন রীতিগুলোতে।

সাপ্তাহিক, ২২ অক্টোবর ২০০৯



সাঁওতালি সোহরাই উৎসব

মাঘের শুরু। শৈত্য প্রবাহ সত্য হয়ে নেমে এসেছে গোটা দেশে। এরই মধ্যে এক সাঁওতাল বন্ধুর আমন্ত্রণে মৃদুলসহ দুই বন্ধু রওনা হলাম দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে। শ্যামলী থেকে বাসে উঠেই নগরের কোলাহল এড়াতে কানে হেডফোন গুঁজে শুনছি রেডিও ফুর্তির গান। কালিয়াকৈর পার হতেই হঠাৎ থেমে গেল ফুর্তির সব সুর। পকেটের পেন-ড্রাইভটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে মুচকি হেঁসে মৃদুল বলল 'ডিজিটাল জার্নি'। গান শোনা আর চাঁদের আলোতে চারপাশ দেখতে দেখতে আমরা পৌছে যাই যমুনা সেতুর কাছাকাছি। সেতু ঘেরা আলোকসজ্জায় দূর থেকে সেতুটিকে মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্নময় তীর। যমুনা পার হয়ে অল্প সময়ে বাসটি পৌঁছে যায় ফুড ভিলেজ হোটেলে। বক্তৃতার ভঙ্গিতে সুপারভাইজার বলে, 'হোটেল বিরতি ২০ মিনিট'। ক্লান্তি কাটিয়ে নির্ঘুম রাস্তায় বাসটি আবারও ছুটে চলে দিনাজপুরের দিকে। অন্ধকার কাটতেই আমরা পৌঁছে যাই কাটারি চাল আর পাপড়ের শহর দিনাজপুরে।

আমরা একটি রিকশায় চেপে সোজা চলে আসি বিখ্যাত পাবনা সুইটসের দোকানে। মুখরোচর ভাজির সাথে গরম পরোটা পেয়ে খালি পেটে চালন করে দেই গোটা পাঁচেক। নাস্তার ঢেকুর তুলে একটি ম্যাজিক বাইক নিয়ে শহর থেকে সোজা রওনা হই বিরলের দিকে।

বিরলে পৌঁছে উপজেলার ডাক বাংলোতে থাকার বন্দোবস্ত করেই আমরা বেরিয়ে পরি সীমান্তবর্তী গিরিডোবার দিকে। গিরিডোবা হলো ঐতিহাসিক পাঁড়ু রাজার বিদ্রোহস্থল। মূলত এটি সাঁওতালি গ্রাম। পৌষ-মাঘ মাসে এখানকার সাঁওতালরা পালন করে সোহরাই উৎসব। সাত দিন ধারাবাহিকভাবে চলা এ উৎসবে সাঁওতালরা শুধু আনন্দেই মেতে ওঠে না বরং এতে এদের জীবনযাপন, দলবদ্ধতা এবং সামাজিক ও পরিবারিক

বন্ধনের চমৎকার চিত্র প্রকাশ পায়। গ্রামটির মধ্যে থেমে থেমে বাজছিল মাদল ও ঢোল। ঢোলের তালে পা মিলিয়ে আমরাও ঢুকে পড়ি গিরিডোবায়। পথেই দালু সরেন আমাদের অভ্যর্থনা জানায়, হাত উঁচিয়ে বলে 'জোহার' মানে 'নমশ্বকার'।

আমরা যখন গ্রামটিতে ঢুকি তখন সোহরাই শুরু হয়ে গেছে। একটি মাঠের মধ্যে আতপ চাল দিয়ে বড় ঘেরাও তৈরি করে তার মধ্যে উপোস থাকা গোত্রের মহত রাগদা হেমব্রন বোঙ্গা বা সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে একে একে বলি দিচ্ছে অনেকগুলো মুরগি। একইসাথে রক্ত মেখে দিচ্ছে মাটিতে। ঘেরাও এর মধ্যে বোঙ্গার উদ্দেশ্যে রাখা রয়েছে সিঁদুর ও পাতার ঠোঙ্গায় সামান্য হাঁড়িয়া। কিন্তু মাঠের মধ্যে কোনো মেয়ের দেখা মিলল না। দালু জানায় এটাই রীতি।

সোহরাই উৎসবের প্রথম দিনের প্রধান আয়োজনটিকে সাঁওতালি ভাষায় বলে 'উম'। প্রথম দিন প্রত্যেক বাড়ির উঠান পানি ও গোবর দিয়ে লেপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। প্রতিঘর থেকে একটি করে মুরগি বা কবুতর সংগ্রহ করে পূজার জন্য সবাই জড়ো হয় মাঠটিতে। অতঃপর মহতের উপস্থিতিতে ঐ স্থানে সমস্ত মুরগি একে একে বলি দেয়া হয়। বলি



সাঁওতালদের ক্ষ্যামটা নাচ

পর্বের পরে মাঠ থেকে সবাই দলবেঁধে নাচ গান করতে করতে চলে আসে মহতের বাড়িতে। এখানে মুরগি দিয়ে সবার জন্য রান্না হয় খিচুরি আর সারা রাত চলে হাঁড়িয়া খাওয়া। মূলত মহতের বাড়িতে রান্নার মধ্য দিয়েই গোটা গ্রামে সোহরাই উৎসবের শুভসূচনা হয়।

সানজিলা হাজদা জানালো সোহরাইয়ের দ্বিতীয় দিনের কথা। সাঁওতালি ভাষায় এটি 'ডাকা'। ঐদিন গোত্রের প্রত্যেকটি পরিবার তাদের নিকট আত্মীয় ও জামাইদের দাওয়াত করে। ফলে সবার বাড়িতে রান্না করতে হয় ভালো খাবার।

সোহরায় উৎসবের তৃতীয় দিনটি চলে হাস্যরস ও আনন্দের মাঝে। এটিকে 'খুনটাও' বলা হয়। ঐদিন একটি উঠানে গোল দাগ দিয়ে দাগের ভিতরে খুঁটি গেড়ে তার সাথে বেঁধে দেয়া হয় একটি ষাড়কে। ষাড়ের শিং আর গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয় তেলের পিঠা বা পাকওয়াল। অতঃপর প্রচণ্ড শব্দে মাদল ও ঢোল বাজানো হয়। ফলে ছটফট করতে থাকে ষাড়টি। এ অবস্থায় দাগের বাইরে থেকে সাঁওতালি যুবকেরা হুড়হুড়ি করে ষাড়ের শিং ও গলায় থাকা তেলের পিঠা নেয়ার চেষ্টা করে। আর এই আনন্দে মেতে ওঠে গোটা গ্রাম।

সোহরাইয়ের চতুর্থ দিনে মাছ বা কাঁকড়া ধরতে গোত্রের সবাই দলবেঁধে বেড়িয়ে পড়ে জাল আর পলো নিয়ে। সাঁওতালরা এই পর্বকে বলে, 'হাকু কাটকোম'। পঞ্চম দিনটিতে পূর্বের চারদিনের অনুষ্ঠানে নিজেদের ভুলত্রুটি সংশোধন ও পরের দিনগুলোর পরিকল্পনা করা হয়। এটিকে 'ঝালি' বলে।

সোহরাই উৎসবের ষষ্ঠ দিনটি মূলত শিকারকেন্দ্রিক। সাঁওতালি ভাষায় এটি 'সেন্দ্রা'। সাঁওতালরা বলে, 'দেলা সেন্দ্রা বন বেলা হা'। ঐদিন সকালে একদল সাঁওতাল তীর-ধনুক দিয়ে বেরিয়ে পরে শিকারে। আর গোত্রের যুবকেরা মহতসহ পরিষদের পাঁচ সদস্যের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচ গান ও বিভিন্ন খেলা দেখিয়ে চাল তুলে জমা করে মহতেরই বাড়িতে।

শিকার শেষে শিকারিদের নিয়ে চলে নানা প্রতিযোগিতা। একটি মাঠে একটি কলা গাছ দাঁড় করিয়ে তার ওপর রাখা হয় মহতের স্ত্রী বা মাঝিবুড়ির হাতের তৈরি তিনটি তেলের পিঠা। দূর থেকে তীর-ধনুক দিয়ে যে কলা গাছ লাগাতে পারে সেই বিজয়ী। বিজয়ীকে আবার পালন করতে

হয় বেশ কয়েকটি নিয়ম। ৫টি ধনুক মাটিতে লম্বালম্বী সাজিয়ে বিজয়ীকে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে এর চারদিক ঘুরে মাটিতে থাকা ধনুক একটি একটি করে তুলতে হয় এবং একই নিয়মে আবার মাটিতে সাজাতে হয়। অতঃপর কলা গাছটি গোত্র পরিষদের ৫ সদসের জন্য ৫ টুকরো করে বিজয়ী কাঁধে নেয় আর অন্য সবাই বিজয়ীকে মাথায় নিয়ে হৈহুল্লোর করতে করতে চলে আসে মহতের বাড়িতে। এখানে সকলকে দেয়া হয় মুড়ি ও হাঁড়িয়া। অন্যদিকে শিকারগুলো দিয়ে রান্না হয় খিচুরি। সারা রাত চলে নাচ, গান আর হাঁড়িয়ার আসর। হাঁড়িয়ায় ভাসতে থাকে সারা গ্রাম।

সোহরাইয়ের সপ্তম দিনটি অনেকটা ঈদ আয়োজনের মতো। ঐদিন গোত্রের সবাই সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাছ মাংস আর হাঁড়িয়া খায়। যে সকল আত্মীয় 'ডাকা' পর্বে দাওয়াত করা হয়েছিল সে আত্মীয়দের এদিন বিদায় জানানো হয়।

কথা শুনতে শুনতেই বলি পর্ব শেষ হয়ে যায়। সবাই দলবেঁধে মাদল ঢোল বাজিয়ে মহতের পিছন পিছন নাচ গান করতে করতে যেতে থাকে তার বাড়ির দিকে। আমরাও পায়ে পায়ে তাল মিলাই। বলি দেয়া মুরগিগুলো দিয়ে মহতের বাড়িতে চলে খিচুরি রান্নার আয়োজন। এই ফাঁকে সবাই নাচছে আর আয়েস করে খাচ্ছে প্রিয় পানীয় হাঁড়িয়া আর চুয়ানি। খোপায় লাল জংলি ফুল দিয়ে সাঁওতালি মেয়েরা দলবেঁধে দিচ্ছে ক্ষ্যামটা নাচ। বন্ধু মৃদুলকে হঠাৎ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। খানিক পরেই তাকে দেখা গেল সাঁওতালি মেয়েদের সাথে তাল মিলিয়ে নাচছে। মনে হচ্ছিল কোনো এক সুখময় রাজ্যে আমরা চলে এসেছি।

সাঁওতাল গ্রাম থেকে যখন ফিরছি তখন চারদিকে নেমে এসেছে নিঝুম অন্ধকার। আকাশে অজস্র তারার মাঝে উঠেছে স্নিগ্ধ চাঁদ। দূর থেকে আদিবাসীদের কণ্ঠে ভেসে আসছে গানের সুর— 'হাম্ভি মেইরী বেত মেসে, তাবেন মেইরী গেট সে, দেলাং মেইরী জানাম ওয়াক তে'।

দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১০, সাপ্তাহিক : ৫ নভেম্বর ২০০৯

মহৎজাতি আদিবাসী মুণ্ডা পাহান

কালিয়াগঞ্জ বাজার পার হতেই বৃষ্টি আরম্ভ। ভদ্র মাসের বৃষ্টি কোনো নিয়ম মানে না। আকাশের যেখানেই মেঘ জমছে সেখানেই ঝড়ে পড়ছে বৃষ্টি। দূর থেকে বৃষ্টি পরার অপরূপ দৃশ্য হরহামেশাই দেখা যায় এই সময়টাতে। এ যেন প্রকৃতির এক অন্য রকম খেয়াল। কখনো কখনো বৃষ্টি গ্রামের সহজ সরল লোকসকলকে এক নিমেষেই ভিজিয়ে দিচ্ছে আবার পরক্ষণেই ঠাঁ ঠাঁ রোদ শুকিয়ে দিচ্ছে সকলকে। ভদ্র মাসে বৃষ্টি পরার সময় দূর থেকে যে কারোই মনে হবে যেন বিশ্ব বিধাতা তার প্রিয় পৃথিবীর সবুজ বাগানগুলোকে নিজ হাতে পানি দিচ্ছেন।

বৃষ্টির ফোঁটা উপভোগ করতে করতেই পৌঁছে গেলাম ভেনতারার মোড়ে। মোড়ের চারদিকে বিশাল আকৃতির শত শত মেহগনি গাছ। গাছের ছায়া ঢাকা নীরবতা যে কোনো পথিককেই একটু বিশ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়। মোড় থেকে বামপাশে কিছুটা পথ এগোলেই রাস্তার ডানে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ন্যাচারাল শালবন। এই শালবন ঘেষে গড়ে উঠেছে একটি ছোট গ্রাম।

গ্রামের নাম গোদাবাড়ি। নাম কেন গোদাবাড়ি হলো সে সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা নেই গ্রামবাসীর। এক সময় এখানের শালবনটি ছিল আরো গহীন। তখন এই শালবনের আশেপাশেই বাস করতো নানা আদিবাসী সম্প্রদায়। বনই ছিল তাদের জীবন। গ্রামটির চারদিকের ঘন সবুজের মাঝে গায়ে গায়ে লাগানো ধূসর মাটির ঘরগুলোর একটিতে সময়ের সাক্ষী হয়ে দিন কাটাচ্ছে ৯০ বছর বয়স্ক মাঠু পাহান। বয়সের ভারে কাঁপা কাঁপা গলায় নাগরী ভাষায় গ্রামটি তৈরি হওয়ার ঘটনাটি জানাতে সে বলে, 'এগলে জঙ্গল রই, জঙ্গল ভাইনকে ঘর বাইধি।' এগিয়ে আসে এই গ্রামের মণ্ডল ও মাঠু পাহানের বড় ছেলে হরিস পাহান। নানা

কথার ফাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয় নিজেদের জাতিসত্তাটিকে। মানকি মুণ্ডা নয়, এ গ্রামের সকলেই আদিবাসী মুণ্ডা পাহান।

মাঠু পাহানের তিন ছেলের মধ্যে চৈতন্য ও পরিমল স্বাধীনের পর পরই চলে যায় ভারতে। ছেলেদের জন্য মাঠুর মন কাঁদে। তারা কেমন আছে, বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে মাঠু পাহান তা জানে না। সীমান্তের কাঁটা তারের বেড়া এই আদিবাসী পরিবারটিকে করেছে বিচ্ছিন্ন। মাঠু জানায় ব্রিটিশ আমলেরও পূর্ব থেকে তারা এখানে বাস করছে। এসেছে ভারতের নাগপুর থেকে। সে সময়ে বন কেটে যে জায়গা সাফ করতো আদিবাসীদের নিয়ম অনুসারে সে জায়গা তারই হয়ে যেত। মাঠু পাহানের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে সেই সব সময়ের কথা।

শিকার করাই ছিল সেই সময়ে আদিবাসী মুণ্ডা পাহানদের প্রধান কাজ। এই সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা দলবেঁধে শিকারে বের হতো গহীণ বনে। এখনো শিকারে বের হওয়ার তিনদিন আগে সকলেই বসে শিকারের পরিকল্পনা করে। পাহান নারীদের 'হাঁড়িয়া' তৈরির প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তাদের ভাষায় বলে, 'হাড়ি রাখন, ধম আসি দিন নিকলো বই।' মুণ্ডা পাহানদের বিশ্বাস শিকারে বের হওয়ার আগে শিকারি ভূতকে সন্তুষ্ট করতে পারলে বেশি শিকার মিলবে। তাদের ভাষায় এটি 'ধুমন উরায়ে'। তাই শিকারে যাওয়ার পূর্বে গ্রামপূজার স্থানে মাটিতে ও গাছে সিন্দুর দিয়ে শিকারি ভূতের কাছে এরা মানত করে। তারা বলে, 'মানতি করলে পাবই, ঘুরকে লেয়ে আসবই।' শিকারি ভূতকে সন্তুষ্ট করার পর পরই এরা শিকারে বের হয়। এখনো আদিবাসী মুণ্ডা পাহানদের শিকারের একমাত্র অস্ত্র তীর-ধনুক। তাদের ভাষায়, 'শিকার-তীর ধনুক লেকে মারা যায়েলা।'

গহীন বনে এক সময় নানা রকম শিকার মিললেও বর্তমানে হারিয়ে যাচ্ছে আদিবাসীদের প্রিয় শিকারগুলো। তবুও এখনো মুণ্ডা পাহানদের পছন্দের শিকারগুলোর মধ্যে আছে 'মুসা' (বড় উদুর), লারেয়া (গাছে থাকা এক ধরনের জন্তু), চুটিয়া (ছোট ইঁদুর), ঘুগু, মায়না (ময়না), লাম্ভা (খরগোশ), কেরকেটা, পেচা, হকসা (বড় পাখি বিশেষ), দুনদু প্রভৃতি। মুণ্ডা পাহানদের শিকারের উপযুক্ত সময় চৈত্র-বৈশাখ মাস। দলবেঁধে শিকার করে দিন শেষে যা পাওয়া যায় তা থেকে প্রথমে শিকারি ভূতকে

দেয়া মানতের একটি শিকার বলি দেয়া হয়। অতঃপর শিকারগুলো গোটা গ্রামের পরিবারগুলোর মধ্যে সমহারে বণ্ঠন করা হয়। এই সমবণ্ঠন রীতির কারণেই শত দরিদ্রতার মাঝেও যুগ যুগ ধরে টিকে আছে আদিবাসীরা। শিকার খাওয়ার সাথে ধুমধামের সাথে চলে হাঁড়িয়া খাওয়া, চলে 'ঝুমের নাচ।'

শিকারে যতই আনন্দ থাকুক না কেন ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই তিন মাস মুণ্ডা পাহানদের কাটাতে হয় সীমাহীন কষ্টের মাঝে। মাঠু পাহানের অভিমত এক সময় আবাদি জমি কম ছিল ফলে অভাব ছিল বেশি। এখন আবাদি জমি বেশি থাকায় তাদের কাজের সুযোগ বেড়েছে। ফলে কিছু কষ্ট হলেও আগের তুলনায় ভালোই আছে আদিবাসী মুণ্ডা পাহানেরা। স্বল্প চাহিদার এই আদিবাসীদের ভালো থাকা আধুনিক সমাজের কাছে চরম দুর্ভিক্ষতা।

মধ্য বয়সী ভারতী পাহান ছুটছে বনের দিকে। অভাবের এই তিনমাস গ্রামটির অধিকাংশ নারীরাই বেরিয়ে পড়ে জংলী কান্দা (আলু)র সন্ধানে। ভারতী পাহান জানায় তারা বন থেকে দুই ধরনের জংলী আলু সংগ্রহ করে থাকে। এর মধ্যে 'পেন্টি কান্দা' সব সময় খাওয়া গেলেও 'গেঠি কান্দা' তেঁতো হওয়ায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় খাওয়ার উপযোগী করতে হয়। প্রথমে গেঠি কান্দা কেটে একদিন পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরদিন সেটি পরিষ্কার করে সিদ্ধ করে পানি ফেলে দিতে হয়। অতঃপর সেটি শুকিয়ে প্রয়োজন মতো লবণ ও হলুদ দিয়ে খেতে হয়। এই গেঠি কান্দা নিয়ে মুণ্ডা পাহানদের মধ্যে নানারকম কল্পিত গীত চালু আছে। ভারতী পাহানের ভাষায়, 'মায়ে বেটি বোনে গেল, গেঠি কান্দা খড়ি লেল, বোঝা ভইর কাঠি বান্ধ।'

মেয়েরা আলুর সন্ধানে বনে বের হলেও এই সময়টাকে গ্রামের পুরুষদের টাকার জন্য ছুটতে হয় মহাজনদের বাড়ি বাড়ি। মহাজনেরাও আদিবাসীদের দুঃসময়ে সদ্ব্যবহার করে। কমরেটে মহাজনদের কাছ থেকে আগাম মজুরি এনে পারিবার চালায় পাহানসহ এ অঞ্চলের আদিবাসীরা। তিন মাস পর যখন ফসল কাটার সময় হয় তখন বাজারে মজুরি বেশি হলেও মহাজনদের জমিতে আদিবাসীদের কাজ করতে হয় আগের রেটে। তেভাগা ও সাঁওতাল বিদ্রোহসহ এ অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে

নানা প্রতিবাদ সংগ্রাম হয়েছিল। কিন্তু 'মহাজন, নামটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন থেকে মুছে যায়নি অদ্যাবধি।

অভাবের এই তিন মাসেই মুণ্ডা পাহানদের পালন করতে হয় 'কারমা' আর 'দুর্গাপূজা'। এখানের পাহান সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা হিন্দু সনাতন ধর্ম পালন করে। অন্য আদিবাসী জাতিগুলো হতে এরা আলাদাভাবে বেশি ধর্মীয় আচারের প্রতি আকৃষ্ট। পূজার কথা বলতে গিয়ে খোকা পাহান নিবিষ্ট মনে বলে উঠেন, 'কে কে যাবেন গংগম স্থানে, হামু যাব ঠাকুর দর্শনে'। খোকা শেষ করতেই পাশ থেকে করমা পূজার গান ধরে কৈলাশ পাহান— 'আমার বন্ধু সওদাগর, নদীর কূলে বান্দে ঘর— বন্ধু হে, উজানে ভাইটানে দুটি ঘর।' মাঝ পথে গান থামিয়ে হেসে হেসে কৈলাশ বলে, 'হাঁড়িয়া না খেলে গিত নেহি নেকলে লা।'

অন্য আদিবাসীদের মতোই নানা বিশ্বাসে ঘিরে আছে মুণ্ডা পাহানদের জীবন। পাহানরা ভূতে বিশ্বাস করে। এদের বাড়ির কারো পেট ব্যথা, বমি বা যে সকল রোগের বহির্প্রকাশ বসন্তের মতো দেখা যায় না সেসব রোগ হলেই এরা মনে করে পাপের কারণে তাকে ভূতে ধরেছে। তাই ভূত তাড়াতে ডাকা হয় ওঝা। এখন মুণ্ডা পাহানদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে।



আদিবাসী মুণ্ডা পাহান সম্প্রদায়ের নারীরা

তাই ঝার-ফুঁকে কাজ না হলে জীবন বাঁচাতে নিকটস্থ গ্রাম্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় এরা।

গোত্রের মহত জানালো নবান্ন উৎসবের কথা। নবান্নকে এরাও বলে লবান। এদের লবান কিছুটা ভিন্ন। লবানের দিন উপোস অবস্থায় সকালে বাড়ির পুরুষ (যে ধান কাটবে) একটি থালার মধ্যে সিন্দুর, পানসুপারি, কলা, ধূপ, প্রদীপ নিয়ে ক্ষেতের পাশের একটি জায়গা লেপে পরিষ্কার করা হয়। সেখানে কলা, পান-সুপারি, প্রদীপ, ধূপ, সিন্দুর রেখে পানি ছিটিয়ে ভক্তি বা সেজদা করা হয়। অতঃপর প্রদীপটি তুলে ধানক্ষেতে নেমে ৩টি ধানের আগাল (আগা) একত্রে মুঠো করে এর ওপর জ্বালানো প্রদীপটি রেখে ধান কাটতে হয়। এরপর প্রদীপটি জমির পাশেই রেখে দেয়া হয়। ঐ ধান কেটে বাড়িতে এনে চাল তৈরি করে অন্য তরকারির সাথে উপোস ভাঙতে হয়। একই সাথে চলে হাঁড়িয়া খাওয়া। এর পরও সুবিধা মতো সময়ে গোত্রের সবাই শুকর বা খাসি জবাই করে সম্মিলিতভাবে পালন করে লবান উৎসব।

কথার আসরে হঠাৎ উপস্থিত হয় মানশি পাহান। বয়স ১৬ কি ১৭। মাথায় ভরাট সিঁদুর। বহুকষ্টে সামলে নিচ্ছেন এক বছর বয়সী কোলের বাচ্চাটিকে। মানশিকে দেখে দলের মণ্ডল বলতে থাকে পাহানদের বিয়ের আনন্দের পর্বগুলোর কথা।

অন্য আদিবাসীদের মতো মুণ্ডা পাহানরা বেশ উৎসবপ্রিয়। ধর্মীয় বিশ্বাস ও নানা আয়োজনে চলে এদের বিয়ের পর্বগুলো। বিয়ের কিছু কিছু পর্ব অন্যান্য আদিবাসী জাতিসত্তার সাথে মিল থাকলেও বেশকিছু আচার মুণ্ডা পাহানদের একান্তই নিজস্ব। পাহানদের বিয়েতে বরপক্ষ মেয়েকে পণ হিসেবে দেয় মাত্র ১২ টাকা। এছাড়াও প্রথা অনুসারে মেয়েপক্ষের জন্য দিতে হয় ৫টি শাড়ি আর 'সাজ দৌড়ী'। সরিষার তৈল, ৫ কেজি চাল, কিছু খাবার তৈল, হলুদ, মরিচ ও অন্যান্য মশলা, ছাতু একত্রে বাঁশের ডালায় সাজিয়ে দেয়াকে পাহানরা 'সাজ দৌড়ী' বলে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য পাহানদের বিয়েতে আসা বরপক্ষের সকলকে পা ধুইয়ে বাড়িতে প্রবেশ করানো হয়। তাদের ভাষায় এটি 'গড় হাত ধুয়া পর্ব'। অতঃপর বড় চালনে থাকা তালের পাখা, কলা, দুধ, আতপ চাল, লাড়ু, গুড়, পান, ঘাস ও প্রদীপের মধ্য থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে ও গুড় খাইয়ে বরকে বরণ করে

নেয় মেয়ের মা, খালা আর ফুফুরা। এটি 'বরকে চুমাহান' পর্ব। পরে সাজানো মারোয়ার (বাড়ির উঠানে পাতা ও কলাগাছ দিয়ে সাজানো স্থান বিশেষ) কাছে উভয়পক্ষের মণ্ডল বা মহতের উপস্থিতিতে বর ও কনে একটি শিলপাটার উপর দাঁড়িয়ে পরস্পর পরস্পরকে সিঁদুর পরায়। এটিই আদিবাসী মুণ্ডা পাহানদের বিয়ের মূল পর্ব। বিয়ের পরপরই শুরু হয় মাদল আর ঢোলের শব্দ। চলে নাচ গানের সাথে হাঁড়িয়া খাওয়া।

এভাবেই নানা দুঃখ, কষ্ট আর অভাবের মধ্যে কেটে যাচ্ছে মুণ্ডা পাহানদের জীবন। নিজেদের চৌদ্দপুরুষের সনাতন ধর্ম পালনকারী এই পাহান গ্রামটির বাইশটি পরিবারের কাছে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রস্তাব এসেছে নানাভাবে নানা সময়ে। পাহান পরিবারগুলো নিজেদের আর্থিক সচ্ছলতা, বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা, ছেলেমেয়েদের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ প্রদানের প্রলোভন পেয়েছে বহুবার। খ্রিস্টান মেম সাহেবদের পদধূলিও গ্রামটিতে পড়েছে বার কয়েক। কিন্তু নিজেদের জাতিধর্ম ত্যাগ না করার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে গ্রামের সবাই। খোকা পাহানের ভাষায়, 'জাত ধ্বংস করমু না।' নিজেদের সনাতন ধর্মের প্রতি এভাবেই মুণ্ডা পাহানরা রয়েছে অবিচল। ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি পাহানরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে মিথ্যা বললে পাপ হয়। আর পাপ হলে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে অথবা যে কোনো হাত বা পা নষ্ট হয়ে যাবে, নতুবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে মিথ্যাবাদী ব্যক্তিটি। যে জাতির বিশ্বাসে মিথ্যার প্রচলন নেই তারা নিঃসন্দেহে মহৎ জাতি। সত্যিই মহৎ জাতি আদিবাসী মুণ্ডা পাহানেরা।

সাপ্তাহিক, ৮ অক্টোবর ২০০৯

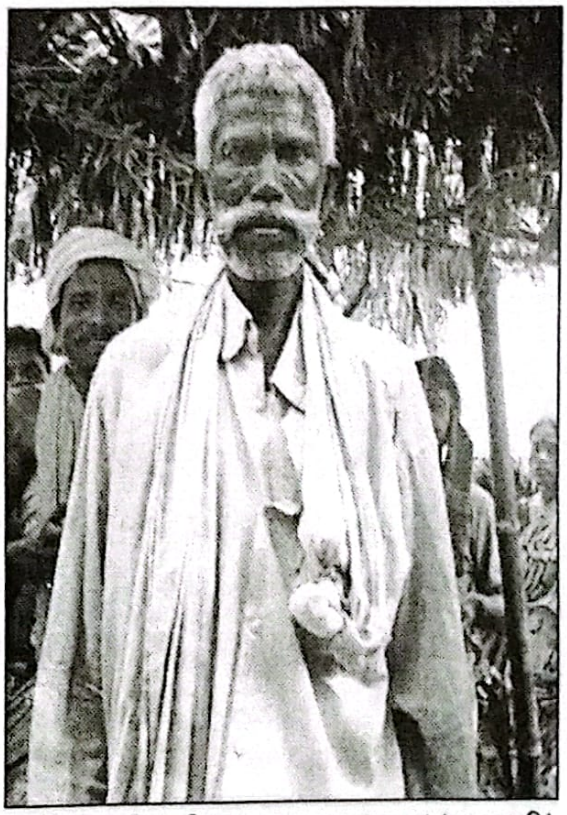
কুকরী বনে আদিবাসী সাঁওতালদের জীবন

আষাঢ় মাস। ব্যাঙের ডাক আর বৃষ্টির টাপুর টুপুর শব্দকে ভুলিয়ে দিয়েছে তীব্র তাপদাহ। চারদিকে লু হাওয়া বইছে। গ্রামের লোকেরা বারকয়েক ঘাম গোসল দিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। আকাশে ছিটে ফোঁটা মেঘের দেখা নেই। প্রকৃতি এ কিসের প্রতিশোধ নিচ্ছে কেউ জানে না। গরম থেকে স্বস্তি পেতে বের হয়েছি সবুজের কাছাকাছি। যতই সবুজের পরিমাণ বাড়ছে ততই শীতল হচ্ছি। বেশ কিছু দূর যেতেই মনের মধ্যে ভয়ের অনুভূতি টের পেলাম। চোখের সীমানায় কোনো জনবসতি নেই। চলে এসেছি একটি শালবনের ভিতর। কিছুক্ষণ পর ধুতি পরিহিত এক বৃদ্ধের দেখা মিলল। নাম জানালো বুদরে মারডি। বয়স সত্তর উর্ধ্ব। নামের শেষের টাইটেল শুনেই বুঝে গেলাম তিনি আদিবাসী সাঁওতাল। এই শালবন চলে গেছে ভারতে সীমান্ত অবধি। সীমান্তের কাঁটা তারের বেড়া আদিবাসীদের পৃথক করলেও পৃথক করতে পারেনি শালবনকে। বনের নামেই দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী এ গ্রামের নাম 'কুকরী বন'।

কথা বলতে বলতে চলে এলাম বুদরে মারডির বাড়ির সামনে। বনের পাশেই তার বাড়ি। উপরে ছন দেয়া গায়ে গায়ে লাগানো তিনটি মাটির ঘর। ভিতরে বেশ পরিচ্ছন্ন। সাঁওতালরা তাদের বাড়ি বেশ পরিচ্ছন্ন রাখে। বাঁশের বেড়া সরিয়ে ভিতরে যেতেই একটি বাচ্চা 'দিকু', 'দিকু' বলে চেচিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল। সাঁওতালি ভাষা বলে কিছু বুঝতে পারলাম না। বুদরে মারডি জানালো, আদিবাসী সাঁওতালরা তাদের ভাষায় বাঙালিদের 'দিকু' নামে ডাকে। এখানের বাঙালিদের সাথে তাদের ভালো সম্পর্ক থাকলেও সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়ে 'দিকু'কে তারা তাদের শত্রু মনে করতো। সে সময়ে এ বাঙালি বা দিকুরাই ছিল জমিদার, মহাজন, দোকানদার ও রেলওয়ে শ্রমিক-ঠিকাদার— যারা কমবেশি সবাই ছিল সাঁওতালদের উপর নির্যাতনকারী।

ছোট বাচ্চাটিসহ ঘর থেকে বের হয়ে আসলো বুদরে মারডির স্ত্রী চানসুরুজ টুডু। তার হাতে শোভা পাচ্ছিল বেশ কয়েকটি শাখা। শাখা কেন পরেন? মুচকি হেসে উত্তর 'ছাংকা কুমি আবু অনাব কুশিয়া' অর্থাৎ হাতের মধ্যে আমরা শাখা পরতেই পছন্দ করি। ঘরের মেঝেতে বসতে বসতে খেতে চাইলাম এক গ্লাস পানি। কিন্তু পানি না দিয়ে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। জানতে চাইলো সত্যিই পানি খাব কিনা। সম্মতি পেয়ে তাদের চোখেমুখে আনন্দের চিহ্ন ছড়িয়ে পড়ে। পরিষ্কার একটি গ্লাসে পানি এনে দিল চানসুরুজ টুডু। পানি নিয়ে তখন এরকম আচরণের কারণ বুঝতে না পারলেও পরে জানলাম এ অঞ্চলের অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানরা সহসা তাদের বাড়িতে কিছু খায় না। পাছে জাত চলে যায়। মুচকি হেসে বুদরে মারডি বলে যারা 'হাঁড়িয়া' খেতে আসে তাদের অবশ্য জাত যায় না।

এই বাড়ির উঠানের এক কোণায় মাটি দিয়ে তৈরি একটি উঁচু জায়গা চোখে পড়ল। কি এটা। কোনো কবর নয়তো। পাশেই একটি জুঁইফুল গাছ। জানা গেল এটি বোঙ্গার প্রার্থনার স্থান। বুদরে মারডি জানায় তারা প্রকৃতি পূজারী। তাদের দেবতাকে তারা ডাকে 'বোঙ্গা'। বোঙ্গার কোনো আকার নেই। তারা বিশ্বাস করে ভালো-মন্দ নিয়ন্ত্রণ করে এই 'বোঙ্গা'। তাই সাঁওতালদের কাছে 'বোঙ্গা' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন গোসলের পর ঐ উঁচু জায়গায় কিছু পানি ছিটিয়ে সাঁওতালরা বোঙ্গার প্রার্থনা করে।



কুকরী বনের সাঁওতালি প্রধান (পারগানা বা মহত) 'শাহা বাছকি'

আদিবাসী এই পরিবারটির মতোই সাঁওতালরা খুবই উৎসবপ্রিয়। এদের রয়েছে বারো মাসে তের পার্বণ। সাঁওতালদের বছর শুরু হয় ফাল্গুন মাসে। উৎসব নিয়ে যখন কথা বলছি তখন বুদরে মারডির চোখেমুখে হাসির ঝলক। কি কি উৎসব হয়। এক নিঃশ্বাসে বুদরে বলে যায় নববর্ষে 'স্যালসেই', চৈত্রে 'বোঙ্গাবোঙ্গি', বৈশাখে 'হোম', আশ্বিনে 'দিবি', পৌষে 'সোহরাই' উৎসব।

অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো না হলেও সাঁওতালরা এখনো পূজার উৎসবগুলোতে আনন্দ করে প্রাণভরে। নাচ-গান আর হাঁড়িয়া ছাড়া সাঁওতালদের কোনো উৎসবই প্রাণ পায় না। গল্প যখন জমে উঠছিল তখন কয়েক বাড়ির ওপাশ থেকে মাদলের চমৎকার তাল মাতাল শব্দ কানে আসছিল। জানা গেল বিয়ের উৎসবে নাচ-গান চলছে সেখানে। বিয়ের কথা শুনে আগ্রহ নিয়ে আমরা চলে এলাম বিয়ে বাড়িতে।

বাড়ির মধ্যে প্রচলিত সাজসজ্জার লেশমাত্র নেই। গাছের তাজা পাতা দিয়ে বাড়ির উঠোন প্রকৃতির কায়দায় সাজানো। মেয়েদের দলবদ্ধ নৃত্যও সেখানে। বাড়িতে ঢোকার মুখেই খালি জায়গায় চোখে পড়ল একটি ছোট গর্ত। গর্তের তিন পাশে ৩টি ধনুক দাঁড় কারানো। প্রশ্ন করতেই পিছন থেকে গোত্রের 'মহত' বা 'পারগানা' (গোত্রপ্রধান) জানালো, এটি 'দা বাপলা'-র (গ্রাম পূজার) স্থান। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো সাঁওতালদের পরিবারিক ও সামাজিক জীবনের সবখানেই মহত বা গোত্রপ্রধানকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। সাঁওতালি এই গোত্রের 'মহত' বা প্রধানের নাম 'শাহা বাসকি'। তিনি চমৎকারভাবে বলতে থাকেন সাঁওতালদের বিয়ের পদ্ধতি।

বিয়ের পূর্বে 'দা বাপলা' বা গ্রামপূজা বাধ্যতামূলক। ছেলে বা মেয়ের মা, খালা, ফুফু (কাকী)রা গ্রামপূজা করে থাকে। দেবতার আশীর্বাদ নেয়াই এ পূজার উদ্দেশ্য। ছোট একটি চারকোণা গর্ত করে তার তিন দিকে তিনটি ধনুক দাঁড় করিয়ে সিঁদুর দিয়ে এই পূজা করতে হয়। গর্তের মধ্যে দিতে হয় 'সিটাকা' (এক টাকার কয়েন), চাউলি (অল্প চাউল), হানডি (হাঁড়িয়া)। শুধু সংস্কৃতি নয় সাঁওতালদের ধর্মাচারের সাথেও অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে 'হাঁড়িয়া'।

মহতসহ আমরা সাঁওতালি নৃত্য দেখতে বিয়ে বাড়িতে আমরা প্রবেশ করি। অপরিচিত চেহারা দেখে হঠাৎ নৃত্য ও মাদলের শব্দ থেমে গেল।

তারা তাদের ভাষায় কথা বলতে লাগল। আমরা কিছু বোঝার চেষ্টা না করেই তাদের ছবি তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় গান্দি মরমুসহ বেশ কয়েকজন ছবি তুলতে বাধা দিল। হঠাৎ তাদের এই অগ্নিশর্মা আচরণের কারণ কি বোঝা গেল না। এগিয়ে এলো গোত্রপ্রধান। পরে জানলাম বেশ কিছুদিন আগে স্থানীয় কয়েকজন এনজিও প্রতিনিধিরা নানা সুবিধার আশ্বাস দিয়ে তাদের ছবি তুলে নেয়। তারা জানতে পারে তাদের ছবি দেখিয়ে, তাদের টিকিয়ে রাখার কথা বলে বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়েছে ঐ এনজিওর কর্তাব্যক্তিরা। ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেছে শুধু এনজিও কর্মকর্তাদের। কিন্তু এদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেনি চুল পরিমাণ। গান্দির সাফ কথা, তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন না ঘটুক কিন্তু তারা তাদের জাতিকে আর বিক্রি হতে দেবে না। খানিক পরে গান্দি মরমু একটি বড় ঢোল বাজিয়ে নৃত্য শুরু করলেন। সাঁওতালি মেয়েরা দলবদ্ধভাবে চমৎকার ভঙ্গিতে নাচছে। ছেলেরা তুনডা (মাদল), তামাক (ঢোল), বানাম (হারমনিয়াম), তিরীয়া (বাঁশি), করতাল (মন্দিরা) বাজাচ্ছে।

বাড়ির মধ্যে একজন বৃদ্ধা পাতা নিয়ে ব্যস্ত। কাছে গিয়ে তাদের শিল্পকর্মে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। শালপাতা দিয়ে চমৎকার কায়দায় তৈরি করা হচ্ছে হাঁড়িয়া খাওয়ার 'খোড়া'। তালমাতাল অবস্থায় এগিয়ে এলো দুলালী মারডি। বলল, 'বাবু হাঁড়িয়া নিউইয়া, ডালমারা হইওয়া' (আজ হাঁড়িয়া খাওয়া হবে, নাচগান ও অনেক আনন্দ হবে)। সাঁওতালিদের নৃত্য ও মাদলের শব্দে মনে হলো কোনো এক আনন্দময় সুখি জাতির মাঝে মিশে আছি। ভাবছি সত্যিই আনন্দের জাতি আদিবাসী সাঁওতালরা।

যখন ফিরছি, সারা গ্রাম তখন হাঁড়িয়ায় ভাসছে। দূর থেকে মাদলের শব্দ আর সাঁওতালি মেয়েদের গান ভেসে আসছে— 'হে গো বিডি, গো বিডি, ঘরে ঘরে যবেক মেয়ে—, আমিতো চললাম লংকা লংকা'

সাপ্তাহিক, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯



পিপল্লা গ্রামের ভুনজারদের জীবন

গতরাত থেকে ঝুম বৃষ্টি। আষাঢ়ের এই প্রথম বৃষ্টি কৃষকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অনেকের কাছে এটি 'রহমতের দানা'। ফসলের জন্য চারদিকে চলছে মাঠ তৈরির কাজ। সকলেই কাজে ব্যস্ত। সাতদিনের মধ্যেই চারা লাগাতে হবে। সময় খুবই কম তার ওপর লোকের অভাব। বেশি মজুরির প্রলোভনেও মিলছেনা মাঠের কাজের লোক।

নয়াদিঘির আজগর এখনো খুঁজছে দুটি পাইট। এখানের স্থানীয়রা মাঠের লেবারদের 'পাইট' বলে। স্বল্প সময়ে মাঠ তৈরিতে সবাই খুঁজে আদিবাসী পাইট। দিনাজপুরের স্থানীয়দের কাছে পাইট হিসেবে আদিবাসীদের বেশ চাহিদা। সবার কাছে এরা যেমন কর্মঠ তেমনি বিশ্বাসী। সাধারণ সময়ে আদিবাসীরা নিজ থেকেই কাজ খুঁজতে আসলেও এ সময়টাতে পাইট খুঁজতে আজগরের মতো অনেককেই যেতে হয় আদিবাসী গ্রামগুলোতে।

গ্রামের নাম পিপল্লা। আজগরসহ যখন গ্রামটিতে পৌঁছলাম তখন মধ্যবিকেল। পাকা রাস্তা পার হয়ে ধান ক্ষেতের আইল দিয়ে যতই গ্রামের দিকে এগোচ্ছি ততই ঢোল আর আদিবাসী গানের অন্যরকম সুর কানে ভেসে আসছে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে দরদ দিয়ে একদল আদিবাসী গাইছে, 'হে ভগবান, পতিসে পাবনে সিতারাম, জেয় ভগবান'। আজগর জানালো ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই তিন মাস যখন কাজ থাকে না তখন এই গ্রামের একদল আদিবাসী জীবিকার জন্য গান করে মন্দির ও বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে। তারই মহড়া চলছে তখন। নাস্তাসহ ১৭০/- পারিশ্রমিকে পাইট হিসেবে আজগর খুঁজে পেলো মালতি আর হরিমহনকে। মাঠে গিয়ে মেয়েরা আবার কি কাজ করবে? জানতে চাইলে মালতি বলে, 'দাদা, কাদো (ধানের চারা) গারি, ঘাস বাচি'। সাঁওতাল ভেবে বললাম তোমরা

তো নিশ্চয়ই সাঁওতাল। জাত রক্ষায় পিছন থেকে হরিমহন কিছুটা চেঁচিয়ে বলল, 'না বাবু, হামারা ভুনজার জাতি'।

পিপল্লা গ্রামে বাস করে ৪৮টি আদিবাসী ভুনজার পরিবার। একটি বড় পুকুরের চারপাশ ঘিরে এদের বাস। এই গ্রামের ভুনজাররা এখনো সাঁওতাল, ওরাও বা অন্য আদিবাসীদের মতো ততটা অস্বচ্ছল নয়। ফলে পূর্বপুরুষদের সনাতন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হওয়ার প্রলোভন তাদের প্রভাবিত করেনি। কথা হলো গোত্রপ্রধান বিসুরা মণ্ডলের সাথে। আদিবাসী ভুনজাররা তাদের গোত্রের প্রধানকে বলে 'মণ্ডল'। তাই নাম বিসুরা হলেও গোত্রের প্রধান হওয়ায় সবাই ডাকে 'বিসুরা মণ্ডল' বলে। বিসুরা জানায়, এ গ্রামের ভুনজারদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা আয়োজনে গোত্রের প্রধান হিসেবে প্রথা অনুসারে তাকে পালন করতে হয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মণ্ডল ছাড়াও আদিবাসী ভুনজার সম্প্রদায়ের গোত্রে থাকে আরো বেশ কয়েকটি দায়িত্বশীল পদ। গোত্রে মণ্ডলের পরই মহতের স্থান। এছাড়া এখনো গোত্রের সকলকে নানা খবর পৌছে দিতে রয়েছে 'কোতয়াল'। গোত্রের অবাধ্য যে কাউকে শাস্তি দেয়ার জন্য আছে 'সিপাহি'।



পিপল্লা গ্রামের ভুনজাররা

এই গোত্রের সিপাহি নকুল ভুনজার জানায়, তাদের সম্প্রদায়ে এখনো 'বন্' প্রথা চালু আছে। কোনো বিষয়ে দলপ্রধানের সিদ্ধান্তের বাইরে গেলে বা অবাধ্য হলে শাস্তি স্বরূপ ঐ পরিবারকে 'বন্' দেয়া হয়। বন্ অবস্থায় ঐ পরিবারকে আগুন, পানিসহ কোনো কিছু দেয়া ও নেয়া অন্যদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

পুকুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ৯০ বছর বয়স্ক কুশিমন। এখানে কতদিন থেকে আছেন? জিজ্ঞেস করেও কোনো উত্তর মিলল না। পাশ থেকে গাবলু ভুনজার বৃদ্ধের পাশে গিয়ে বলল, 'কেতনা দিন এহাছে'। জানা গেল, বয়সের ভারে আদিবাসী ভুনজারদের 'খন্টা' ভাষা ছাড়া বৃদ্ধা অন্য কোনো ভাষা বুঝতে পারে না। বৃদ্ধা এখানে আছে ব্রিটিশ আমল থেকেই।

অল্পবয়সী একটি মেয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। নাম আরতী বালা। মাথায় ভরাট সিঁদুর। জানা গেল, এক মাস আগে বিয়ে হয়েছে তার। ভুনজারদের বিয়ের পর্ব হয় কিভাবে, জানতে চাইলে মেয়ের মা উসিলা বালা আগ্রহ নিয়ে জানায় বিয়ে সংক্রান্ত চমৎকার সব তথ্য। আদিবাসী ভুনজারদের বিয়েতে কোনো ব্রাহ্মণ নয় বরং ডাকতে হয় 'লোউরা' বা নাপিতকে। এই লোউরা বর ও কনের কানি আঙ্গুল কেটে সামান্য রক্ত নিয়ে আমপাতার মধ্যে ঐ রক্ত ও সামান্য আতপ চাল একত্র করে উভয়ের হাতেই বেঁধে দেয়। অতঃপর কনের শাড়ির সাথে বেঁধে দেয়া হয় বরের ধুতি আর উভয় পক্ষের মণ্ডল ও সকলের উপস্থিতিতে বর কনের চারদিকে পাঁচবার ঘুরে কনের কপালে সিন্দুর (সিঁদুর) পরায়। সিঁদুরের পরেই শুরু হয় ভোজপর্ব আর সারা রাত চলে আদিবাসী নৃত্য ও হাঁড়িয়া খাওয়া।

বিয়ের লেনদেন সম্পর্কে আদিবাসী ভুনজারদের বেশকিছু তথ্য আমাদের অবাক করে। বাঙালি সমাজে প্রকাশ্যে বা গোপনে যৌতুক নেয়ার প্রবণতা থাকলেও আদিবাসী ভুনজারদের এখনো মেয়েপক্ষকে পণ হিসেবে দিতে হয় ২৯ টাকা ও আধা মণ চাল। আদিবাসী ভুনজারদের যে কোনো অনুষ্ঠানে শূকর বা খাসির মাংস খাওয়ানো হলেও তাদের পছন্দের তালিকায় আছে বিজু, কুচিয়া (কুচ্ছা), মুসো (ইঁদুর), দুরা (কচ্ছপ), গোঙ্গা (শামুক), কোকড়া (কাঁকড়া) প্রভৃতি। এরা মনে করে, এগুলো খেলে

অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। মালতির ভাষায় 'বিজু খালে প্যারালাইসিস নে হোতে' (বিজু খেলে প্যারালাইসেস হয় না)। হরিমহন ভুনজার বলে 'মুসো খালে পিলে নে হোতে' (ইঁদুর খেলে ভুড়ি হয় না)। গোত্রের মণ্ডল বলে 'কোকড়া খালে খেসরা নে হোতে' (কাঁকড়া খেলে বসন্ত রোগ হয় না)। ভুনজাররা মনে করে টাকার অভাবে দুধ খেতে না পারলেও কুচিয়া দুধের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় তাদের অনেক টাকা দিলে খ্রিস্টান হবে কি না জানতে চাইলে গোত্রের মণ্ডলের সাফ জবাব, 'হবো না তো, কেনে হবে'।

কথা হলো যুবক বয়সী মানু ভুনজারের সাথে। তার সকল আনন্দ পূজাকে ঘিরে। মানু জানায় হিন্দুধর্মের প্রায় সব পূজাই ভুনজাররা উদ্‌যাপন করলেও ভাদ্র মাসে কালি পূজার ছয়দিন পর এরা পালন করে একটি বিশেষ ধরনের পূজা। তাদের ভাষায়, 'সূর্যা হু পূজা'। এই পূজার তিন দিন আগ থেকে পবিত্রতার সাথে থাকতে হয় উপোস। উপোস অবস্থায় দুধ-কলা ছাড়াও খাওয়া যায় বিনা লবণে আতপ চালের ভাত। ভুনজারদের ভাষায় এটি 'খির'। পূজার দিন সকালে সূর্য উঠার সময় নদীর মধ্যে কোমর পানিতে নেমে সূর্যকে ভোগ দিয়ে প্রার্থনা করা হয়। তাদের বিশ্বাস এই পূজার মাধ্যমে একইসাথে সূর্য ও গঙ্গার আশীর্বাদ পাওয়া যায়।

সামরি বালার বাড়িতে ঢুকতেই দেখা গেল পূজার স্থান ও দেবতা। সে জানায় এটি তাদের দৈনন্দিন দেবতা বিষহরি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেবতার পূজা দেয় সে। তার বিশ্বাস পূজা না করে পাপ কাজে লিপ্ত থাকলে এক সময় অনেককেই স্বপ্নে ভয়ংকর সাপ দেখতে হয়। সামরির মতো আদিবাসী ভুনজাররা এখনো 'ভূতে' বিশ্বাস করে। বাড়িতে কারো পেটের ব্যথা বা বমি হলেই তারা বলতে থাকে 'ভূতে ধরলেছে'। আর এর জন্য ঝাড়ফুঁকই একমাত্র চিকিৎসা।

অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো আদিবাসী ভুনজারদেরও একসময় ছিল শত শত বিঘা জমি। জমি থাকলেও অধিকাংশ আদিবাসীরা ছিল সহজ সরল। দলের মণ্ডল জানায়, ব্রিটিশ আমল থেকে এরা এখানে থাকলেও এদের অধিকাংশ জমি আজ অন্যের দখলে। এখন প্রায় সবাই ভূমিহীন। কিছু জমি নিয়ে চলছে স্থানীয়দের সাথে বিরোধ। আর সে কারণেই প্রায়ই পেতে হয় প্রাণনাশের হুমকি।

হরিমহনের বক্তব্য একটু ভিন্ন। সে মনে করে মূর্খতাই আদিবাসীদের জমি বে-দখল হওয়ার অন্যতম কারণ। হরিমহনের ভাষায়, 'হামনির জমি জোর করে মানসে লেলেল কে, হামনি মূর্খ গতিকে মানসে লেলেল কে'। তাই দুই ছেলেকেই সে লেখাপড়া শিখাচ্ছে। বড় কোনো স্বপ্নে নয়। তার বিশ্বাস ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখলে তাদের জমি আর অন্য কেউ বে-দখল করে নিতে পারবে না, ঠকাতে পারবে না। হরিমহন বলে 'পড়ালেখা করলে আর ঠোকাল নে পারতে'।

ফেরার পথে বার বার কানে বাজছিল হরিমহনের কথাগুলো। একই দেশে কোনো জাতির সন্তানেরা লেখা পাড়া করছে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে আর অন্য জাতির সন্তানেরা লেখাপড়া করছে শুধুই ঠকানো থেকে রক্ষা পেতে। স্বপ্নের এই বৈষম্য নিয়েই কি এ দেশে বড় হতে থাকবে আদিবাসীর সন্তানেরা। তাতে কি মিলবে বৈষম্যহীন সমাজ?

সাপ্তাহিক, ১ অক্টোবর ২০০৯



গিরিডোবার সাঁওতালি হাঁড়িয়া

প্রকৃতির মতো শক্তি নিয়ে চলে গ্রামের মানুষেরা। ক্লান্তি তাদের ছুঁতে পারে না। প্রাণচঞ্চল আর ক্লান্তিহীন তরুণ সাইদুল। গোটা গ্রামের আনাচে কানাচে সকল বাড়ি তার চেনা। সাইদুলসহ চলছি বহবলদিঘির দিকে। আসলে কোনো দিঘি নয়, দিনাজপুরের একটি গ্রামের নাম এটি। প্রধান সড়ক পিছনে ফেলে ভিতরে যেতে থাকি আমরা। বেশ কিছুদূর যেতেই মনে হলো নতুন কোনো গ্রামে প্রবেশ করেছি। গ্রামের লোকদের চেহারা খানিকটা অন্যরকম। জানা গেল উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় আদিবাসী সম্প্রদায় এরা। এরা সাঁওতাল।

গ্রামের নাম গিরিডোবা। মূলত এটি সাঁওতাল গ্রাম। পঁয়ত্রিশটি সাঁওতাল পরিবারের বাস এখানে। নিজের কৃষি জমি না থাকলেও কৃষিই এদের প্রধান কাজ। হয়তো এ কারণেই সাঁওতালদের কৃষি সংস্কৃতির জনক ও ধারক বলা হয়ে থাকে। একটি খাটিয়ায় দুজন বৃদ্ধকে আধোঘুম অবস্থায় পাওয়া গেল। তাদের পরনে সাদা ধুতি। এদের মধ্যে মেনকা মুরমু'র বয়স ৭৫ বছর। ছেলের বাড়িতে তার বসবাস। পরিবারের বাকিরা থাকে ভারতে। আদরের দুই মেয়ে দুলালী ও মেনচো অনেক আগেই চলে গেছে সেখানে। মেয়ে দুটো বেঁচে আছে কিনা জানে না সে। অন্যদেশ ভারত তার বাড়ির নিকটবর্তী হলেও সীমান্ত তাদের পৃথক করে দিয়েছে। একটি কাঁটা তারের বেড়া তাকে করেছে বাংলাদেশী আর মেয়ে ও অন্য আত্মীয়দের বানিয়েছে ভারতীয়।

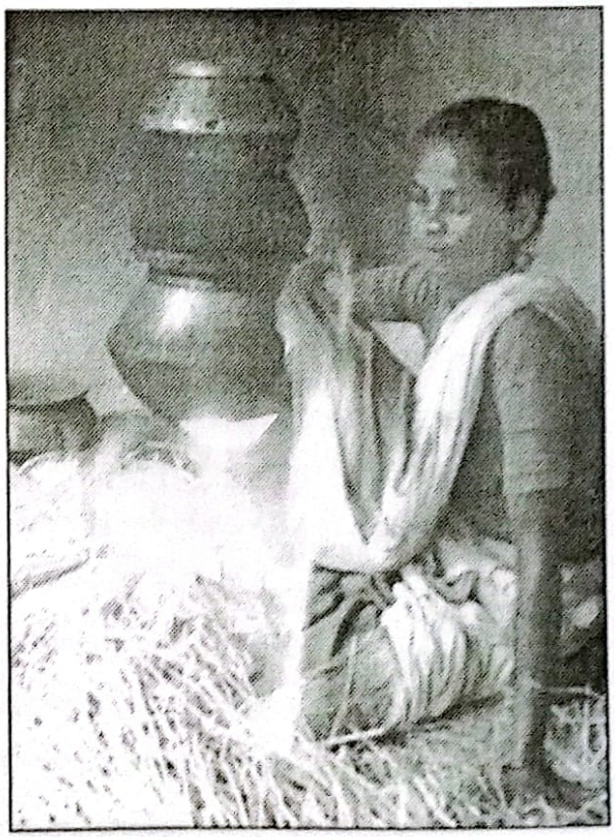
তারা প্রকৃতভাবে থাকতে চেয়েছে সাঁওতালি জাতি হিসেবে। এই দেশ তাদেরও। এই দেশ ছাড়ার কথা চিন্তাও করতে পারে না মেনকা। দীর্ঘ জীবনে সে দেখেছে কিভাবে দরিদ্রতা শেষ করে দিয়েছে সাঁওতালি জাতিকে। কথাগুলো যখন বলছিলো তখন তার চোখেমুখে কষ্টের ছাপ ছড়ালো।

পথের ধারেই ভাঙাচোরা একটি বাড়ির দেখা মিলল। বাড়ির ভিতর থেকে বের হলো দু'জন সাঁওতালি মহিলা। পরনে সাধারণ শাড়ি। কাপড় সস্তা হওয়ায় এখানের সাঁওতালি মেয়েরা এখন আর পাচি, পাচাতাত ও মথা (সাঁওতালি পোশাকের নাম) পড়ে না। তাদের উভয়ের চোখেমুখে ভয়ের চিহ্ন। এদের মধ্যে ভারতী হাজদা বেশ চটপটে। আমাদের বলল বইডে (বসতে বলা)। পাশের মহিলাকে বলল, 'দুরুপা এইদি একিন' (সাঁওতালি ভাষায় অতিথিকে বসতে দাও)। তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হলেও তাদের ভয়ের কারণ বুঝতে পারলাম না। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলতে থাকলাম। উদ্দেশ্য তাদের অস্বাভাবিকতা কাটানো। অনেক পরে সফলও হলাম। কৌতূহল নিয়ে পাশের বাড়ির সুমিত্র মুরমু এলো। আমাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে ছোট খাটিয়ায় বসতে দিল তারা।

এই সাঁওতাল বাড়িটি বেশ জীর্ণশীর্ণ। একপাশে গরু ছাগল রাখার ঘর। অন্যপাশের এক কোণায় মাটির চুলায় তিনটি বড় পাত্র একটির উপর আরেকটি বসানো। নিচে চুলায় খড় দিয়ে আগুন জ্বালানো হচ্ছে। কি রান্না হচ্ছে এরকম ব্যতিক্রমী কায়দায়। কোনো উত্তর মিলল না। সবাই প্রসঙ্গ বদলানোর চেষ্টা করল। কিন্তু মিথ্যা উত্তরের আশ্রয় নিল না কেউই। আমাদের কৌতূহল বেড়ে গেল। তাদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করতে লাগলাম। অবশেষে ভারতী জানালো আজ রাতেই ফুলবাড়ি থেকে করোয়া (বিয়ের ঘটক) আসবে পাত্রপক্ষসহ (জামাই কোড়া) তার মেয়ে (বকরী) সোনামণি হেমব্রন এর বিয়ের পাকা কথা বলতে। পাত্রপক্ষকে খুশি রাখার জন্য তৈরি করা হচ্ছে 'হাঁড়িয়া' (সাঁওতালি মদ)।

'হাঁড়িয়া' সাঁওতালদের প্রিয় পানীয়। 'হাঁড়িয়া' ছাড়া তাদের কোনো উৎসব সম্পন্ন হয়না। 'হাঁড়িয়া' সাঁওতালদের যে কোনো উৎসবে অপরিহার্য উপকরণ। আমরা বুঝে গেলাম বাঙালি হওয়ায় 'হাঁড়িয়া' তৈরির অপরাধে কিংবা 'হাঁড়িয়া' খাওয়ার দাবীর মুখে অপদস্থ হওয়ার শনৃকাই ছিল তাদের ভয়ের কারণ। বিয়ের অনুষ্ঠানে 'হাঁড়িয়া' না খাওয়ালে সাঁওতালিদের বদনাম হয়। 'হাঁড়িয়া' সাঁওতাল জাতিসত্তার সাথে মিশে আছে গভীরভাবে। অভয় পেয়ে ভারতী জানায় তিন কেজি চাউলের 'হাঁড়িয়া' তৈরি করলে ৪-৫ জন খেতে পারে। বড় যে কোনো অনুষ্ঠানে তারাই কয়েক ডেগে (পাতিলে) 'হাঁড়িয়া' তৈরি করে।

তাদের এই প্রিয় পানীয় তৈরির পদ্ধতিও অভিনব। প্রথমে চাউল দিয়ে ভাত রান্না করে তা পাটিতে ঢেলে ঠাণ্ডা করতে হয়। এই ঠাণ্ডা ভাত দাওয়াই (তাদের ভাষায় জংগলের লিল তক ও চাউলের আটা দিয়ে তৈরি গোলা) ভেঙে মিশিয়ে হাঁড়িতে ৩-৫দিন শুকনো অবস্থায় রাখতে হবে। পাঁচদিন পর বিশেষ ধরনের গ্যাস তৈরি হলে প্রয়োজন মতো পানি দিয়ে হাঁড়ির উপরে ও নিচে বিশেষ কায়দায় সমানভাবে তাপ দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। এক ঘণ্টা জ্বাল দিলে সেটি পাতলা ভাতের মাড়ের মতো আকার ধারণ করে। এটিই হাঁড়িয়া। সাধারণত ঠাণ্ডা করে মাটির হাঁড়িতে পরিবেশন করা হয়। ভারতী যখন হাঁড়িয়ার তথ্য দিচ্ছিল তখন চুলায় তাদের সেদিনের হাঁড়িয়ার শেষ জ্বাল হচ্ছিল। হঠাৎ ভারতী বলে উঠলো 'চালাসে কাজল গিদরে রা য়ে, (বাচ্চা কাঁদছে, তাকে আনো)। ছোট বাচ্চার কান্না থামিয়ে ফিরে এলো সে। বড় মেয়ের বিয়ের চিন্তা ও ছোট বাচ্চাদের সামলানো মা হিসেবে সবই করতে হচ্ছে তাকে। পৃথিবীর সব জাতির মায়েদের অনুভূতি একই। পাশের বাড়ির সুমিত্র মুরমু জানায় সাঁওতালদের বিয়েতে শুধু তাদের গোত্রের লোকদের দাওয়াত করা হয়। খুব বেশি হলে এলাকার চেয়ারম্যান বা মেম্বার দাওয়াত পান।


সাঁওতালি 'হাঁড়িয়া' তৈরি করছে ভারতী হাজদা

বাঙালি প্রতিবেশীরা কেমন জানতে চাইলে সকলেরই এককথায় সোজা উত্তর 'ভালো'। ভালো হলে দাওয়াত না করার কারণ। ভারতী বলে, আমরা আদিবাসী সাঁওতাল। আমরা শূকুর খাই, হাঁড়িয়া খাই। ওরা এগুলো ঘেন্না করে। অনেক সময় উঠতি বয়সের বাঙালি ছেলেরা

নেশার জন্য জোর করে আমাদের 'হাঁড়িয়া' খেতে চায়। এটি আমাদের সংস্কৃতি আমরা কেন 'হাঁড়িয়া' দেব।

বর্তমান সময়ে দরিদ্রতাই সাঁওতালিদের সঙ্গী। দরিদ্রতার হাত থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই নিজের চৌদ্দ পুরুষের ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টান হয়েছে। অন্যদের মতো খ্রিস্টান কেন হচ্ছেন না জানতে চাইলে ভারতী নীরব থাকে। খানিক পরে বলে, 'জাত বিক্রি করব কেনে'।

দরিদ্রতার সাথে যুদ্ধ করে জাতধর্ম রক্ষা করে চলছে এ অঞ্চলের সাঁওতালরা। ভারতীর মেয়ের বিয়ের নিশ্চয়ই আজ পাকা কথা হবে। ঠিক হবে বিয়ের দিনক্ষণ। 'হাঁড়িয়া' খেয়ে সম্মানিত হবে বরপক্ষ। মেয়ের বিয়েতে 'হাঁড়িয়ার' সাথে থাকবে সাঁওতালি নৃত্য। আনন্দে মেতে উঠবে গোত্রের সবাই। হাঁড়িয়া ও সাঁওতালি নৃত্যের আনন্দে ঢেকে যাবে মেয়ের বিয়ের জন্য ঋণ পরিশোধের দুশ্চিন্তা।

সাপ্তাহিক, ১৮ জুন ২০০৯

নিভৃত এক মুক্তিযোদ্ধা আদিবাসীর গল্প

১৪ ডিসেম্বর। সারা দেশে পালিত হচ্ছে বুদ্ধিজীবী দিবস। নানা আয়োজনে উচ্চারিত হচ্ছে ১৯৭১ এ রাজাকার, আল বদর আর আল শামস বাহিনীর কুকীর্তির কাহিনী। দাবি উঠছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের। আর এক দিন পরই মহান বিজয় দিবস। ডিসেম্বর তাই শোকের মাস, একই সাথে আনন্দের। ডিসেম্বর জাতির সূর্যসন্তানদের গর্জে ওঠার মাস। মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানানোর মাস।

দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী উপজেলা বিরল। সারা দেশের মতো এখানেও চলছে বিজয় উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি। নানা স্লোগানের রংচোঙ্গা ব্যানার ঝুলছে সবখানে। রাস্তায় চলছে ধান বোঝাই বড় লরি আর ছোট ভটভটি। সেগুলোতে পত্ পত্ করে উড়ছে লাল সবুজের পতাকা। ডিসেম্বর তাই পতাকা ওড়ানোর স্বাধীনতার মাস।

গ্রামের হোটেলগুলোতে অবিরতভাবে বাজছে 'জয় বাংলা বাংলার জয়'-এর মতো মুক্তিযুদ্ধের গান। অথচ অন্য সময়ে এখানে হরহামেসাই শোনা যেত হিন্দি গানের সুর 'তু চিজ বারী হে মাস্তে মাস্তে'।

হোটেলের মধ্যে চা বানাতে বানাতে মাঝ বয়সী আরিফুল জানালো আজ 'বিরল মুক্ত দিবস'। দিবসটি উপলক্ষে এবারই প্রথম সরকারিভাবে আয়োজন করা হয়েছে নানা অনুষ্ঠানের। পাঁচদিনব্যাপী বিজয় মেলার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনার জন্য তৈরি হয়েছে বিজয়মঞ্চ। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানাবে সংসদ সদস্যসহ স্থানীয় সুধীসমাজ। মুক্তিযুদ্ধের নানা কাহিনী, মুক্তিযোদ্ধাদের নানা দাবিসহ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সরকারের নানা পরিকল্পনার কথা জানবে বিরলবাসী।

চায়ে চুমুক দিয়ে সকল মুক্তিযোদ্ধা উপস্থিত থাকবে কিনা জানতে চাইলে চা খেতে আসা এক ভদ্রলোক পাশ থেকে উত্তর দেন, 'অনেক অমুক্তিযোদ্ধাও

উপস্থিত থাকবেন।' লোকটির কথায় অবাক হলাম। পরিচয় জানতেই মুচকি হেসে নিজেকে পরিচিত করলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে।

লোকটি ৭নং সেক্টরের যোদ্ধা ছিলেন। নাম রবাট আর এন দাস। পরিবারের পাঁচভাইয়ের মধ্যে সবাই মুক্তিযোদ্ধা। বড় ভাই জর্জ জে এম দাস শিববাড়ি ইয়ুথ ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন। সকলের কাছে তিনি জর্জভাই নামে পরিচিত। একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে পরিচিত হতে পেয়ে নিজেকে বেশ ধন্য মনে হলো।

রবাট জানালো, 'বাঁচার পথ' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি আদিবাসীদের নানা বিষয় নিয়ে কাজ করছেন। নানা কথার ফাঁকে তার কাছ থেকে জানতে পারি নিভৃত ও বঞ্চিত এক মুক্তিযোদ্ধা আদিবাসীর কথা। যিনি শিববাড়ি ইয়ুথ ক্যাম্পে জর্জ জে এম দাস এর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে হিলিসহ রামসাগর এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরেও যিনি পাননি মুক্তিযোদ্ধার কাগুজে সনদ।

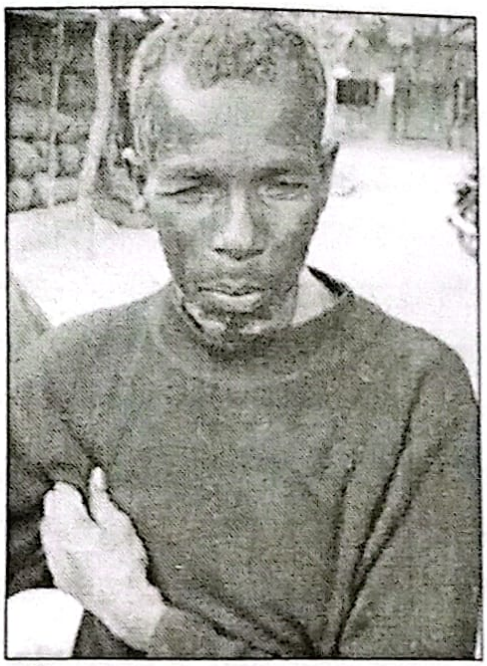
আদিবাসী এই মুক্তিযোদ্ধার নাম থোপাল কড়া। সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারেই নিজ নাম থোপাল এর শেষে সম্প্রদায়ের নাম 'কড়া'। রবাটের মুখে অভিমানী এই মুক্তিযোদ্ধার কথা শুনে আমাদের আগ্রহ বেড়ে যায়। তাই তার সাথে দেখা করতে রওনা হই বিরলের সীমান্তবর্তী হালজার গ্রামের দিকে।

মূলত এ গ্রামটিতে নানা আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস। চলার পথেই নানা ভাষাভাষির লোক দেখে তা বেশ টের পাওয়া যায়। গ্রামটিতে সাঁওতালদের আধিক্য থাকলেও আছে ওরাও, ভুনজার, মুণ্ডা পাহানসহ অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়। সে হিসেবে গ্রামটিকে আদিবাসী গ্রাম বলাই শ্রেয়।

রবাট জানালো এক সময় এ গ্রামে কড়া সম্প্রদায়ের দু'শটি পরিবারের বসবাস ছিল। অথচ এখন গোটা বাংলাদেশের মধ্যে টিকে আছে মাত্র ১৯টি পরিবার। এ গ্রামেই বাস করছে ১৬টি পরিবার। ভূমিসংক্রান্ত বিরোধের কারণেই স্বতন্ত্র ধর্ম ও ভাষাভাষির এ সম্প্রদায়টির অধিকাংশ লোকই চলে গেছে ভারতে।

পাকা রাস্তা পার হয়ে আমরা নেমে পড়লাম গ্রাম্য পথে। এ রাস্তাটি বেশ অপ্রশস্ত ও ভাঙাচোরা। রাস্তার দুদিকে তুতগাছের সারি শেষ হতেই পাড়া আকৃতির একটি ছোট গ্রাম। বিধ্বস্ত কিছু বাড়ি চোখে পড়ল এখানে।

এনজিওদের দেয়া একটি পাকা ল্যাট্রিন আর একটি টিউবওয়েলই গ্রামটিতে আধুনিকতার একমাত্র চিহ্ন। এটিই মুক্তিযোদ্ধা থোপালের 'কড়া' গ্রাম।


মুক্তিযোদ্ধা থোপাল কড়া

গোত্রের মাহাতো জগেন কড়ার সাথে আমার পৌঁছে যাই থোপালের বাড়িতে। ভাঙাচোরা একটি মাটির ঘর থেকে বের হলো তার স্ত্রী তুলো কড়া। সাথে তিন সন্তান রাকি কড়া, সুমন কড়া আর মুক্তা কড়া। তুলো আমাদের দেখেই কড়া ভাষায় বলে 'জোহার' (নমস্কার)। বসতে দেয়ার মতো তেমন কিছু না পেয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে তুলো ঘরে চলে যায়। খানিকপরেই ধরে ধরে নিয়ে আসে মুক্তিযোদ্ধা থোপাল কড়াকে। তুলো জানালো দুই দিন ধরে জ্বরের সাথে যুদ্ধ করছে সে।

কারিতাস থেকে ৪০০০ টাকা ঋণ নিয়ে কেনা ভ্যানগাড়িটিই এ পরিবারটির আয়ের একমাত্র পথ। প্রতিদিন ৮০ থেকে ১০০ টাকা আয় করে তা দিয়েই চলে সংসার। জ্বরের কারণে দুই দিন ভ্যান চালাতে পারেনি মুক্তিযোদ্ধ থোপাল। তাই কুড়িয়ে আনা কঁচু শাক দিয়েই চলছে তিন বেলা।

২০০১ সালে থোপালের পরিবারের সাথে জমিজমা নিয়ে বিরোধ হয় স্থানীয়দের। হুমকির ভয়ে পরিবারের অন্যান্য ভাইবোনেরা সে সময় পালিয়ে যায় ভারতের কুসমন্ডি থানার জামবাড়ি গ্রামে। কিন্তু নানা হুমকিতেও মুক্তিযোদ্ধা থোপাল দেশ ছাড়ে না। একইভাবে নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতেও ততটা আগ্রহী নন তিনি। তবুও আমাদের অনুরোধের চাপে মলিনমুখে বলতে থাকেন মুক্তিযুদ্ধের সময়কার নানা স্মৃতি।

বাবা পোকুয়া কড়া আর মা ফকনি কড়ার ছয় সন্তানের মধ্যে থোপাল কড়া ছিল দ্বিতীয়। রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে বড় ভাই গোপাল কড়ার সাথে তিনিও দেশ স্বাধীন করার জন্য উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। গোপাল ও

গোত্রের আরেক যুবক সাতান কড়া গোপনে আদিবাসীদের যুদ্ধে যাওয়ার প্রচারণা চালাতে থাকে, কড়া ভাষায় সকলকে বলতে থাকে, 'চালা দেশ স্বাধীন কারোওয়ে, সবইন মিলকে দেশ স্বাধীন কারোওয়ে'।

যুদ্ধ শুরুর পর পরই বড় ভাই গোপাল কড়া যুদ্ধে চলে যায়। কিন্তু পরিবারের চাপে তখনো থোপাল যেতে পারে না। দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে যেতে তাঁর মন আনচান করতে থাকে। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে মার কাছে নানীবাড়ি বেড়াতে যাওয়ার নাম করে থোপাল পালিয়ে চলে যায় মুক্তিযুদ্ধে। প্রথমে শিববাড়ি ইয়ুথ ক্যাম্পে ট্রেনিং নেন। ট্রেনিং শেষে ৭নং সেক্টরের অধীনে কমান্ডার ইদ্রিস আলীর নেতৃত্বে হামজাপুর ক্যাম্প থেকে হিলিসহ নিকটবর্তী গ্রামগুলোকে শত্রুমুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের নানা কাহিনী বলতে গিয়ে থোপালের চোখ বার বার ভিজে যাচ্ছিল। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে কতদিন না খেয়ে কেটেছে, কতরাত কেটেছে ডোবার পানির মধ্যে, গোরস্থানে। যুদ্ধের সময়ে থোপাল সহযোদ্ধাদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখেছেন কাছ থেকে। যুদ্ধের সময় দূর থেকে হানাদার আর রাজাকার বাহিনীর অত্যাচারের কথা শুনে নিজের পরিবারের চিন্তায় থোপাল আঁৎকে উঠতেন। সহযোদ্ধা খলিল, কবির, রফিক, নুয়ন আর নুরু মিলে একটি গ্রামকে শত্রুমুক্ত করার কথা বলতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা থোপাল কড়া আবেগতাড়িত হয়ে পরেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দিনাজপুর স্টেডিয়ামে অস্ত্র জমা দিয়ে থোপাল কড়া ফিরে আসেন নিজেদের কৃষিকাজে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আদিবাসী-বাঙালি একসাথে যুদ্ধ করলেও স্বাধীনের পর পর সবকিছু বদলে যেতে থাকে। থোপাল আক্ষেপ করে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন হলো আর আমরা হয়ে গেলাম সংখ্যালঘু আদিবাসী সম্প্রদায়।' ভূমি নিয়ে চলে নানা ঘটনা। কিছুদিন আগেও গোত্রের অন্ত কড়াকে স্থানীয়দের হুমকির মুখে দেশ ছাড়তে হয়েছে। থোপাল বলে স্বাধীনের পর এ দেশ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে 'হামে নাহি খোজেয়ে'।

থোপাল জানায়, মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধে অংশগ্রহণের যে কাগজপত্র তার ছিল তা দিয়ে পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা সনদ গ্রহণের নিয়ম, পদ্ধতি ও সুবিধা লাভের বিষয়টি ছিল তার কাছে বেশ অস্পষ্ট। সীমান্তবর্তী গ্রামের এই

মুক্তিযোদ্ধা ভাবতেন, 'কাগুজে এই সনদ দিয়ে কি হবে।' তাই অযত্নে পড়ে থাকা কাগজগুলো বন্যার পানিতে ভেসে যায়। শুধু মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকে থোপালের মনে। আজও এই স্বাধীন দেশে প্রতিটি দিনই তার কাটাতে হয় জীবনযাপন আর গোত্র টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে। নিজেকে পরিচয় দেন না মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধ করার বিপরীতে সুবিধা লাভে তিনি আগ্রহী নন। তিনি বলেন, 'যুদ্ধ করেছি দেশের জন্য, শুধু চাই স্বাধীন দেশে নিজের অধিকারটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতে।'

মুক্তিযোদ্ধা এই আদিবাসীর সাথে যতই কথা বলছিলাম ততই তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হচ্ছিল। কাগুজে সনদ না থাকায় কোনো ডিসেম্বরেই থোপালের মতো মুক্তিযোদ্ধারা সম্মানিত হন না। এ দেশে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরি হয়নি অদ্যাবধি। যার উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজন ছিল যুদ্ধের পরপরই। অথচ অবাক আর লজ্জিত হতে হয় যখন দেখা যায় অমুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকারেরাও মুক্তিযোদ্ধা ভাতা নিচ্ছেন, পাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধার সম্মান।

এ দেশে সরকার পরিবর্তনের পরপরই পরিবর্তিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা। সে সুযোগে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সনদপত্র পায় অমুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারেরাও। ফলে স্বাধীনতার পর নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়ছে জাতির সূর্যসন্তানেরা। মুক্তিযুদ্ধের ৩৮ বছর পরেও এ দেশে থোপাল কড়ার মতো নিভৃত, বঞ্চিত, ত্যাগী ও অভিমানী মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে পাওয়া যায়। যাদের কোনো কাগুজে সনদ নেই। আছে দেশের জন্য বুকভরা ভালোবাসা।

তাই দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে থোপাল কড়াদের মতো মুক্তিযোদ্ধা, আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন। শোনা যাচ্ছে এ সরকার প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরির উদ্যোগ নিবে। নিয়মনীতির বেড়াজাল ভেঙে থোপাল কড়াদের মতো মুক্তিযোদ্ধা আদিবাসীদের কি ঠাঁই হবে সে তালিকায়। মুক্তিযোদ্ধার কাগুজে সনদ পাওয়া না পাওয়ার দোলায় এভাবেই হয়তো একদিন নিভে যাবে একজন সূর্যসন্তানের জীবনপ্রদীপ।

সমকাল, কালের খেয়া, ৫ মার্চ ২০১০; সাপ্তাহিক, ১৫ এপ্রিল ২০১০

সাংস্কৃতিক গ্রন্থাগার



দুলালী মারডির বিয়ে

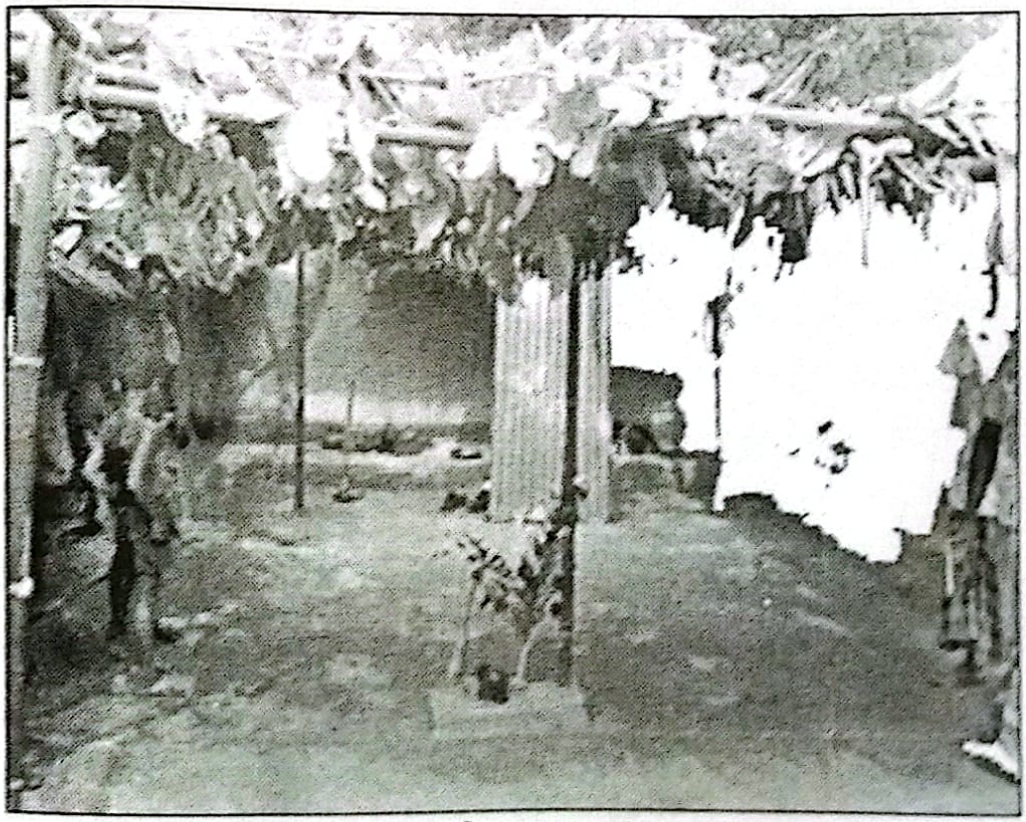
দুলালীর যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স দশ। সাঁওতালি প্রথা মতে বিয়ে হয় পাশের উপজেলার টিংকু মারডির সঙ্গে। নিজের বাল্যকালের ছেলেমানুষিপনাকে কাটিয়ে স্বামীকে খুশি করা সম্ভব হয়নি দুলালীর। ফলে স্বামী টিংকু সুখী হওয়ার সহজ নিয়মে অল্পদিনের মধ্যেই আরেকটি বিয়ে করে। দুলালী ছোট হলেও নিজের সংসারে আরেকজন নারীর অবস্থান মেনে নিতে পারেনি। ফলে টিকে থাকেনি তার সংসার। সাঁওতালদের নিয়ম মোতাবেক দুপক্ষের 'পারগানা' বা 'মহত'-এর উপস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে ছাড়াছাড়ি হয় তাদের। বিয়ের কয়েকদিন পরই মেয়ের সংসার ভাঙার কষ্ট সহ্য করতে পারেনি মা লারগী টুডু। চলে আসেন দিনাজপুরের বিরল উপজেলার কুকরী বনে। বাপমরা মেয়ে দুলালীকে নিয়ে আশ্রয় নেন ভাই স্বপন টুডুর বাড়িতে। মামাবাড়ির সুখ-দুঃখের মাঝেই জীবন কাটতে থাকে দুলালীর। বাল্যকালের ঝরে পড়া স্মৃতিগুলোর মতোই দুলালী ভুলে যেতে থাকে স্বামী-সংসারের কথা।

সেই দুলালীর আবার বিয়ে হচ্ছে আজ। বয়স এখন উনিশ। জীবনের মানে এখন তার কাছে অনেক বড়। স্বামী-সংসারের দায়িত্বটুকু পালন করে কিভাবে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হয় সেটা তার কাছে পরিষ্কার। নিজেই অনুভব করতে পারে দশ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ের পরিণতির কথা। এবার বিয়ে হচ্ছে চিরিরবন্দর উপজেলার বারকো টুডুর সঙ্গে। আমরা দুলালীর বিয়ের খবর পেতাম না যদি না আমাদের সঙ্গে মোকাররম হোসেনের পরিচয় হতো। গ্রামের সকলেই তাকে ডাকে 'মোকা' বলে। আদিবাসী কিংবা বাঙালি সকলেরই বিপদের শেষ ভরসা এই 'মোকা'। তাই বাঙালি হলেও আদিবাসীদের যে কোন অনুষ্ঠানে 'মোকা' না থাকলেই নয়। মোকার সঙ্গে আমরাও চলে এলাম দুলালী মারডির বিয়েতে।

'রায়বাড়ি' বা ঘটকসহ জামাইপক্ষ আসলো 'ঐয়ুব' (বিকেল) বেলায়। সাঁওতালদের বিয়েতে কতজন আসবে পূর্ব থেকে তা নির্ধারিত থাকে না। এরা আসলো চল্লিশজনের মতো। প্রথমে জামাইকে গোসল করিয়ে বিয়ের ধুতি ও শার্ট পরানো হলো। সবাইকে দেয়া হলো শরবত ও মুড়ি। অতঃপর দুলালীর মা, কাকী (খালা, ফুফু)-রা চলল পূজা দিতে। আমরা ছুটছি তাদের সাথে। সাঁওতালরা বিয়ের আগে 'দা বাপলা' বা গ্রাম পূজা দিয়ে দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে থাকে।

একটি মাঠের মধ্যে ছোট একটি চারকোনা গর্ত করে তার তিন দিকে তিনটি ধনুক দাঁড় করিয়ে সিঁদুর দিয়ে এই পূজা করতে হয়। গর্তের মধ্যে দিতে হয় 'সিটাকা' (এক টাকার কয়েন), চাউলি (অল্প চাউল), হানডি (হাঁড়িয়া) ও পানি। পূজা শেষে সেই গর্তের পানীয় ছোট একটি কাঁসার মগে করে বাড়িতে নেয়া হলো কনেকে গোসল করানোর জন্য। সাঁওতালদের বিশ্বাস এই পানি মিশিয়ে কনেকে গোসল করালে সে পবিত্র হবে। তাদের ভাষায় একে 'ডোবরো সাপা করা' বলে।

দুলালীকে গোসল করানোর পর এখন সাজানো হবে। আমরা অপেক্ষা করছি কোন ধরনের শাড়ি তাকে পরানো হবে। বেনারশি, কাতান,



মেয়ের বাড়িতে পাতা দিয়ে সাজানো ও নিচে 'দানু এক্'

নাকি জর্জেট। সব অনুমানকে পিছনে ফেলে দুলালীকে পরানো হলো হলুদ ফ্যাকাশে রঙের সাদামাটা একটি কাপড়। দুলালীর কাকী বাহামন টুডু জানায়, বিহার (বিয়ের) এই শাড়ির নাম 'সিন্দুর ঘানডি'। বাজার থেকে ১২ হাত সাদা কাপড় কিনে সেটিকে কাঁচা হলুদের মধ্যে ডুবিয়ে পরে তা শুকিয়ে তৈরি করতে হয় এই 'সিন্দুর ঘানডি'।

সাজানোর পর দুলালীকে আনা হলো বরের পাশে। আমরা ভাবছি এখনই হবে বিয়ের পর্ব। কিন্তু না, বাহামন মুচকি হেসে জানালো এবার হবে ছেলেমেয়ের পাপমুক্তির পর্ব বা 'উল ছাকাম লোটাদা'। একটি কাঁসার ছোট বাটিতে তিনটি আমপাতা ভিজিয়ে তিনবার ছেলেমেয়েকে আবার তিনবার মেয়েছেলেকে ছিটালো। সাঁওতালরা মনে করে এতে পাপমুক্তি ঘটে। এবার নিশ্চয়ই বিয়ের পর্ব। আমরা ধরেই নিয়েছি বিয়ের মন্ত্রপাঠ শুরু হবে এখনই। কিন্তু কোনো মন্ত্র নয়। সাঁওতালদের বিয়ের পর্বে থাকতে হবে শুধু মহতকে। পরিবারিক ও সামাজিক জীবনের সবখানেই সাঁওতালদের 'মহত' বা গোত্রপ্রধানকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়।

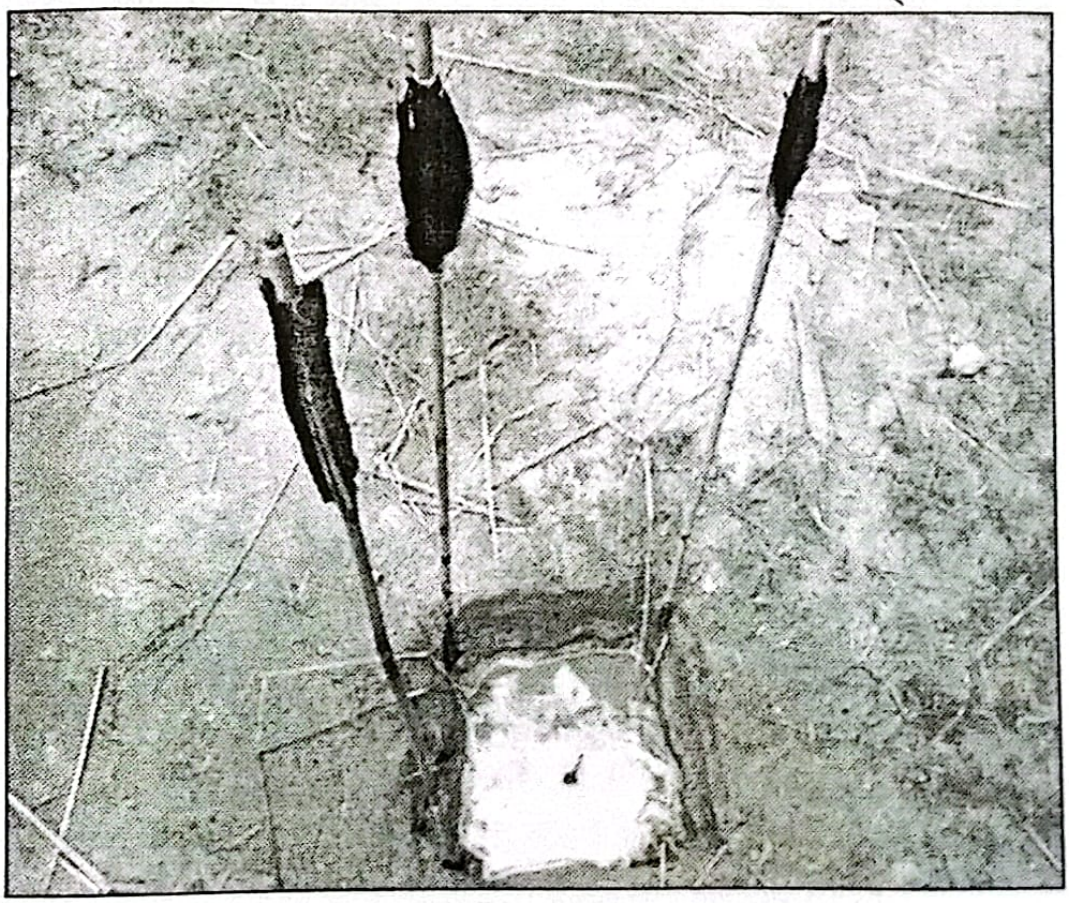
মহত রবিন বাছকির উপস্থিতিতে দুলালীকে একটি বড় বাঁশের তৈরি ডালায় (দৌড়) বসানো হলো। ডালায় দেয়া হলো হুড়ু (ধান), ধুপরি ঘাস (দূর্বা ঘাস)। খানিক পরে উপস্থিত হলো বরের ছোটভাই (দেওরা)। ডালায় বসা অবস্থায় ডালাসহ দুলালীকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে আসলো উঠোনের এককোনায়। যেখানে দুপক্ষের সকলকে দেখা যায়। উভয় পক্ষের মহতের সামনেই শুরু হলো সিঁদুর পর্ব। ছেলেকে তার দুলু (দুলাভাই) নিজ ঘাড়ের উপর বসালো। ছেলে এখন তার দুলুর ঘাড়ে আর দুলালী ডালাসহ তার দেওড়ার ঘারে। এ অবস্থায় ছেলে দুলালীর মাথায় পরিয়ে দিল সিঁদুর। নিচ থেকে সবাই হৈহুল্লোর করে তাদের শুভেচ্ছা জানালো। এই সিঁদুর পর্বই সাঁওতালদের বিয়ের প্রধান পর্ব।

সিঁদুর পর্ব যখন শেষ হলো তখন রাত প্রায় আটটা। বরপক্ষের সকলকে এক পাশে খাওয়ানো হচ্ছে, অন্য পাশে চলছে 'দান একু' পর্ব। বিয়ের পর আশীর্বাদের জন্য দুলালী ও তার বরকে পাশাপাশি বসানো হলো। সামনে মাটি ও গাছের বা ফুলের ডাল দিয়ে তৈরি করা ছিল ছোট উঁচু জায়গা। গোটা উঠোন সাজানো ছিল নানা ধরনের গাছের পাতা দিয়ে। বর ও কনের সামনে রাখা হলো বিয়ের ডালাটি। দুলালীর আত্মীয়স্বজনরা

একে একে ডালা থেকে ঘাস ও ধান বর-কনের মাথায় ছিটিয়ে আশীর্বাদ করে এবং তার হাতে তুলে দেয় তাদের উপহার বা টাকা।

আমাদের আগ্রহ দেখে 'মহত' রবিন বাছকির আগ্রহও বেড়ে যায়। তার কাছ থেকে জানা গেল সাঁওতালদের বিয়ের আরো কিছু তথ্য। কনেকে বরের বাড়িতে নেয়ার পর দান পর্ব চলে আরেকবার। সেটাকে 'মাডোয়া' বা বাসি বিয়ে বলে। বাসি বিয়ের জন্য ছেলের বাড়িতে মাটি ও ছোট উলডার (আমের ডাল) দিয়ে উঁচু জায়গা তৈরি করে সেখানে রাখা হয় দুটি কতরি (মাটির হাঁড়ি), সাসাং (কাঁচা হলুদ), হুড়ু (ধান), ধুবি ঘাস (দূর্বা ঘাস)।

আমাদেরকে খাওয়ার জন্য ডাকা হলো। দুলালীর বিয়ের খাবার ভাত, খাসির মাংস, মুরগির মাংস ও ডাল। আমরা যখন খেতে যাচ্ছি সকলেরই খাওয়া তখন শেষ। কেউ কেউ ঢেকুর তুলছে আর আয়েস করে খানিকটা হাঁড়িয়া খেয়ে নিচ্ছে। হাঁড়িয়া খাওয়া সাঁওতালদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। খেতে খেতেই লক্ষ্য করলাম মাদল বেজে উঠেছে। আমরা বুঝে গেলাম এখনই শুরু হবে আদিবাসী সাঁওতালি নৃত্য। একে



'দা বাপলা' বা গ্রামপূজার স্থান

আনন্দনৃত্য বললে ভুল বলা হবে না। দুলালীর বিয়ের আনন্দে মেয়েরা দল বেঁধে গাইতে গাইতে নাচছে আর ছেলেরা বাজাচ্ছে মাদল, ঢোল, মন্দিরা। রাত যত গভীর হচ্ছে মাদলের শব্দ তত বেড়ে যাচ্ছে। সারা গ্রাম হাঁড়িয়া ও সাঁওতালি নৃত্যে মেতে উঠছে। সকালে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মধ্যরাতে আমরা বাড়ি ফিরলাম।

সকালে যখন দুলালীর বাড়িতে পৌঁছলাম তখনো নাচ-গান চলছে। অনেকেই হাঁড়িয়া খাচ্ছে। দুলালীর কাকী জানালো দুলালীকে বিদায় দেয়া হবে। একটি বাটিতে গুড় ও কাঁসার গ্লাসে পানি নিয়ে দুলালীর মা ও উভয় পক্ষের সকলেই রওনা হলো গ্রামের অন্য একটি বাড়ির দিকে। আমরা ভেবেছি হয়তো বিয়ের কোন পর্ব বাকি রয়েছে। কিন্তু তা নয়। জানা গেল, সাঁওতালদের বিয়ের বিদায়পর্ব হয় গোত্রের 'মহত' বা প্রধানের বাড়ি থেকে। সেখানে দুলালীর মা লারগী টুডু প্রথমে দুলালী ও বরের মুখে গুড় ও পানি তুলে দিলেন। পরে দুই পক্ষের 'মহতে'র উপস্থিতিতে বর 'বারকো টুডু'র বাবার হাতে তুলে দিলেন দুলালীকে।

দুলালী চলে গেল তার স্বামীর বাড়িতে। আমরা জানলাম, সেখানে গিয়েও 'মাঙোয়া' বা বাসি বিয়ে হবে। হবে 'দান একু' বা দান পর্ব। একদিন পর মেয়ের বাড়ির সকলেই গিয়ে সারা রাত আনন্দ করে পরের দিন নিয়ে আসবে বর-কনেকে। মেয়ের বাড়িতে বর-কনেকে পাশাপাশি বসিয়ে খেতে দেয়া হবে মুড়ি, চা ও হাঁড়িয়া। এরপর গোত্রের মহত উভয়কে বলবে আজ থেকে তোমরা 'জুরিপারি' বা স্বামী-স্ত্রী। আদিবাসী সাঁওতালরা এ পর্বকে বলে 'চুপোর খাজুরী"।

আমাদের সমাজে মেয়ের বাড়ি থেকে যৌতুক নেয়া রোধ করতে সরকার আইন করেছে। অথচ আদিবাসী সাঁওতালদের বিয়েতে এখনো ছেলেপক্ষ মেয়েকে পণ দিয়ে থাকে। যদিও বর্তমানে এই পণ দিতে হয় সাধ্যের মধ্যে। দুলালীর চোখেমুখে সুখের আনন্দচিহ্ন। এখন সে স্বামীর গোত্রভুক্ত। উনিশ বছরের দুলালী কি পারবে তার স্বামীর সংসারে টিকে থাকতে? পারবে কি স্বামীকে খুশি রাখতে? এরকম নানা প্রশ্ন ভিড় করে দুলালীর মা লারগী টুডু মনে। সন্তান নিয়ে পৃথিবীর সকল জাতির মায়েদের চিন্তা একই ধরনের।

সাপ্তাহিক, ৯ জুলাই ২০০৯

ওরাও বিশ্বাসে উল্কি ও সিঁদুর

চামড়ায় ভাঁজ পড়া এক বৃদ্ধা পাটি বুনছে আপন মনে। বয়স নেহায়েত কম হবে না। একশ কিংবা তারও বেশি। কোনো সাড়াশব্দ নেই তার। দশবার বছরের এক শিশু বাড়ির উঠানে তুলসি দেবতাকে ভক্তি দিচ্ছে ফুল ছিটিয়ে। সে জানালো বৃদ্ধা 'নিপাকে নানী'। রংপুর থেকে বেড়াতে এসেছেন মেয়ের বাড়িতে। আমরা কাছে এগোই। তবুও যেন বৃদ্ধার দৃষ্টি পড়ে না আমাদের ওপর। আনমনে পাটিই বুনে যাচ্ছেন তিনি।

পিছন থেকে জোহার বলে আমাদের বসতে বলে বৃদ্ধার মেয়ে শুকুমনি টিগ্‌গা। মেয়ের কণ্ঠে বৃদ্ধা মুখ তোলে। আমাদের দেখে এক চিলতে হাসি যেন ছুঁয়ে যায় মুখে। শুকুমনি জানালো তার মায়ের নাম 'পারলো টিগ্‌গা'।

এ গ্রামটি দিনাজপুরের একেবারে সীমান্তবর্তী। গ্রামের নাম বহবলদিঘি। বহবলদিঘির ওরাওপাড়াতেই পারলো বিয়ে দিয়েছে তার মেয়েকে। মা ও মেয়ের গলায় চামড়ার ওপর কালো রঙের দাগ আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। দাগগুলো প্রায় একই ধরনের। গলায় কিসের দাগ? প্রশ্ন করতেই কাঁপা কাঁপা গলায় পারলোর উত্তর। এটি 'উল্কি'।

প্রকৃতজনেরা কখনো বয়সের ভারে কাবু হয় না। এ কারণেই পারলো বেশ কর্মঠ ও প্রাণবন্ত। সে জানালো ওরাওদের উল্কি তৈরির নিয়ম এবং উল্কি নিয়ে নানা বিশ্বাসের কথা।

ওরাও সম্প্রদায়ে বার-চৌদ্দ বয়সে নিয়মানুসারে শরীরে উল্কি আঁকতে হয়। এক প্রকার লতা বেটে তার সাথে মাটির পাতিলের নিচে পোড়া কালি আর দুধ মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা হয়। অতঃপর এক জোড়া সুচ আগুনে পুড়িয়ে দেহের যেখানে যেখানে উল্কি আঁকতে হবে সেখানে দ্রুত স্পর্শ করে আঁকা হয় নানা চিত্র। এরপর সে জায়গায় লতাবাটা, কালি আর দুধ মিশ্রণ লাগিয়ে দেয়া হয়। ঘা শুকালে কালো রঙের চিরস্থায়ী উল্কির আকার চামড়ার মধ্যে ভেসে ওঠে। এ রং সারা জীবনে একটুকুও পাল্টায় না।

কবে এবং কেন ওরাও সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের মাঝে উল্কির প্রচলন হলো? এ নিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো ওরাওদের বিশ্বাসে বদ্ধমূল হয়ে আছে প্রাচীন এক কাহিনী। পারলো টিগ্গা থেমে থেমে বলতে থাকে কাহিনীটি— 'পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতে মানুষ ছিল এক জাতের। কারো কোনো পেশা ছিল না। পেশা না থাকায় ছিল না জাতও। পেশা গ্রহণের জন্য ধরমেশ সবাইকে ডেকে পাঠালেন। সবাই উপস্থিত হলো।

ধরমেশ একজনকে দিলেন লাঙ্গল। তখন সে হলো চাষি। আরেকজনকে দিলেন কুঠার। সে হয়ে গেল কাঠুরে। একজনকে দিলেন মাছ ধরার জাল। সে হলো জেলে। একজনকে দিলেন কাপড় বোনার সূতা। সে হয়ে গেল তাঁতি।

সবাই সবকিছু পেল। অবশিষ্ট থাকলো একটি দোতারা। শেষে এক ব্যক্তি পেল সেটি। সে ব্যক্তি দোতারা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায়। ফলে সমাজে তার সম্মান বেড়ে যায়।

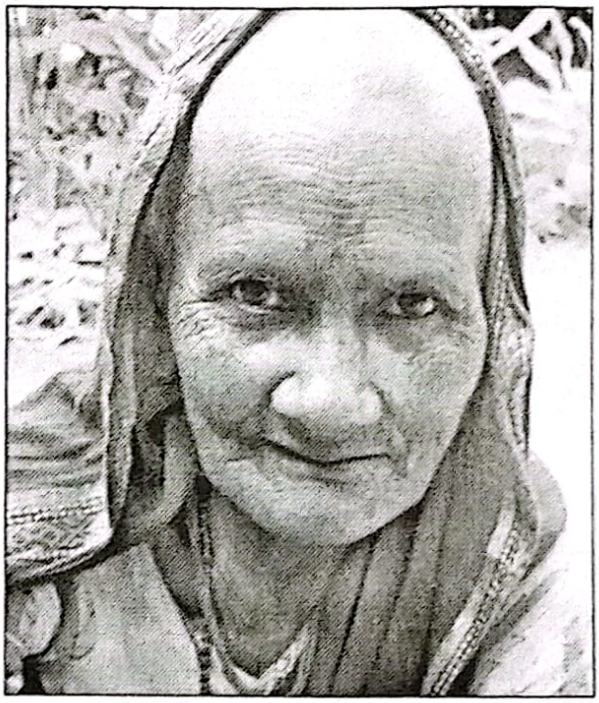
একদিন সে বাড়ি ফিরে রান্না ভালো না হওয়ায় স্ত্রীকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেন। মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রী বনে চলে যায়। বনের মধ্যে ছিল এক দেবতা। তার দয়া হলো। তিনি তার কান্না থামালেন আর বললেন, 'আমি তোমাকে এমন কাজ দেবো যে কাজের জন্য সবাই তোমাকে আদর করবে।'

দেবতা তাকে উল্কি আঁকার সব পন্থা শিখিয়ে দিল। সে থেকেই পৃথিবীতে উল্কির প্রচলন হয়। শুধু উল্কি চিহ্ন নয়, উল্কি শিল্পীও ওরাওদের কাছে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়'।

আদিবাসী সমাজে উল্কি ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রাচীনতম নির্দশন। আদি পর্যায়ে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সনাক্তকরণের একমাত্র চিহ্ন ছিল এই উল্কি। ওরাও সমাজে এ রীতির প্রচলন অধিক মাত্রায়। এরা উল্কি অঙ্কনের পূর্বে পূজা দেয় এবং তাতে বলির ব্যবস্থা থাকে। উল্কি যেন ভালোভাবে আঁকা হয়, ঘা যেন তাড়াতাড়ি শুকায় আর অপদেবতাদের দৃষ্টি যেন কোনোভাবেই না পড়ে সেটিই থাকে পূজার উদ্দেশ্য।

তাই মেয়ে ও ছেলে সবাই শরীরের বিভিন্ন স্থানে উল্কি আঁকে। সাধারণত উল্কির স্থান হাতের তালু, হাতের এপিঠ ওপিঠ, বুক এমনকি গণ্ডদেশ। উল্কি হিসেবে আঁকা হয় লতাপাতা, গোলচক্র, পশুপাখি, সূর্য,

চন্দ্র, তারা প্রভৃতি। আদিবাসী ওরাওরা বিশ্বাস করে উল্কি ছাড়া কোনো ধুমকুরিয়ায় যেতে পারে না। একইভাবে কোনো নারী বা পরুষ যদি উল্কিবিহীন মারা যায় তবে যমরাজা তাকে মানবরূপে গ্রহণ করে না। ফলে অনন্তকাল তাকে নরকে থাকতে হয়। এ কারণে ওরাও সম্প্রদায়ে কারো শরীরে উল্কি না থাকলে মৃত্যুর পরে দাহর আগে তার শরীরে উল্কি একে দেয়ার রীতি চালু আছে।



কপালে উল্কি চিহ্নিত ওরাঁও বৃদ্ধা পারলো টিগ্‌গা

উল্কি নিয়ে যখন নানা আলাপ চলছে তখনই সেখানে উপস্থিত হয় পাশের বাড়ির দুলালী টপপো। তার চুলের সিতা বরাবর ভরাট সিঁদুর দেয়া। সাজগোজ বেশ পরিপাটি। বোঝা যায় কয়েকদিন আগেই বিয়ে হয়েছে তার। দুলালীর সাথে কথা বলতে বলতেই সেখানে চলে আসেন গোত্রের মহত টেম্পু টিগ্‌গা। টেম্পু জানলো সিঁদুর নিয়ে ওরাওদের বিশ্বাসের নানা কাহিনীগুলো।

আদিবাসীরাই প্রথম সিঁদুরের প্রচলন শুরু করে। তারা মনে করে লাল রং ভগবানের পছন্দের। তাই বিয়ে ও পূজার আনুষ্ঠানিকতাসহ নানা রীতিতেই ব্যবহার করা হয় সিঁদুরকে। বিয়েতে মেয়েদের নতুন জীবনের সূচনাক্ষণে হয় সিঁদুর দান পর্বটি। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো ওরাওরা বিশ্বাস করে লাল রঙে আছে অতিমাত্রায় জীবনসার। তাই লাল রং তাদের কাছে যৌন চিহ্ন ও বিজয়ের বার্তাঘোষক হিসেবে বিবেচিত হয়। সিঁদুর নিয়ে ওরাওদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীটি শুনি মহতের জবানিতে।

'চার বন্ধু কোনো এক কাজে অন্য দেশে রওনা হলো। যেতে যেতে তারা পৌঁছলো এক জঙ্গলের কাছে। ঠিক তখনই রাত নেমে আসলো। তখন কি আর করা, সবাই সিদ্ধান্ত নিলো জঙ্গলের মধ্যেই রাত্রিযাপনের।

বিপদ এড়াতে পালাক্রমে একজন একজন জেগে থেকে পার করে দেবে রাত্রিটি। সে রকমই পরিকল্পনা।

চার বন্ধুর মধ্যে একজন কাঠুরে, একজন স্বর্ণকার, একজন তাঁতি এবং চতুর্থজন ছিল সিঁদুর বিক্রেতা। প্রথমে কাঠুরে জেগে থাকলো আর বাকি তিনজন ঘুমিয়ে পড়ল। কাঠুরে জেগে জেগে কি করবে? সে একটি কাঠ কেটে এনে তা থেকে গড়লো অপরূপ সুন্দরী— এক নারীমূর্তি। মূর্তি তৈরি করেই স্বর্ণকার বন্ধুটিকে জাগিয়ে দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বর্ণকার বন্ধুটি ঘুম থেকে জেগেই নারীমূর্তিটিকে দেখে তো অবাক! সে জেগে আর কি করবে? গয়না তৈরি করে সাজালো মূর্তিটিকে। অতঃপর সে তাঁতি বন্ধুটিকে জাগিয়ে নাক ডেকে ঘুমাতে থাকল।

তাঁতি জেগে জেগে কি করবে? সে কাপড় তৈরি করে মূর্তিটিকে সুন্দর করে জড়ালো। অতঃপর সে সিঁদুর বিক্রেতা বন্ধুটিকে জাগিয়ে নিজে ঘুমিয়ে পড়ল।

সিঁদুর বিক্রেতা নারীমূর্তি দেখে তো অবাক। দুপুর রাত্রে এমন সুন্দরী নারী মূর্তি কোথা থেকে এলো? সে আর কি করবে। সিঁদুর পরিয়ে দিল মূর্তিটিকে। আর অমনি নারীমূর্তিটি প্রাণ পেয়ে কথা বলতে থাকল।

শব্দ পেয়ে অন্য বন্ধুদের ঘুম ভাঙল। সবাইতো অবাক। মূর্তি হয়ে গেছে সুন্দরী রমণী। কাঠুরে বলে, 'ও আমার। কারণ, আমিই ওকে প্রথম গড়েছি।' স্বর্ণকার বলে, 'আমি ওকে সাজিয়েছি। তাই ও আমার।' তাঁতি বলে, 'আমি ওর লজ্জা ঢেকেছি। সুতরাং ও আমারই হবে'। সিঁদুর বিক্রেতা বলে 'আমার সিঁদুরে ও প্রাণ পেয়েছে। তাই ও আমার।' –এ নিয়ে চার বন্ধুর মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়।

ঝগড়া দেখে সেখানে উপস্থিত হয় এক দেবতা। চার বন্ধুই দেবতাকে সব কথা খুলে বলে এবং সুন্দরী রমণীকে তাদের দাবি করে। সব শুনে দেবতা খানিক হাসেন।

অতঃপর দেবতা রায় দেন, 'যে কাঠ দিয়ে মূর্তি গড়ল সে ওর বাবা। যে অলংকার তৈরি করে সাজিয়েছে সে ওর মামা। যে কাপড় পরিয়েছে সে ওর ভাই। আর যে সিঁদুর দান করে ওর প্রাণ দিয়েছে সে ওর স্বামী।' দেবতার রায় মেনে নিয়ে চারবন্ধুই বাড়ি ফিরে আসে।'

সিঁদুর দান থেকে এভাবেই একটি সুখী পরিবার তৈরি হয়।

বাঙালি হিন্দুসমাজে সিঁদুরের ব্যবহারটি এসেছে আদিবাসী সমাজ থেকেই। হিন্দুদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পুরাণ, ভবিষ্যৎ পুরাণ প্রভৃতিতে ঘট স্থাপনের কথা বলা হলেও কোথাও সিঁদুরের উল্লেখ নেই। বাংলার ভট্টভবদেব এবং পশুপতি পণ্ডিতসহ অনেকেই সিঁদুর দানের বিষয়ে পৌরাণিক কোনো শাস্ত্র খুঁজে পাননি। ফলে সর্বপ্রথম পালযুগে ভট্টভবদেব এবং পশুপতি ভদ্র হিন্দুসমাজে প্রচলিত প্রথানুসারে 'শিষ্ট সমাচারাৎ' মারফত সিঁদুর দানের স্বীকৃতি দেন। অথচ তারও বহুপূর্ব থেকে ব্রাহ্মণ স্বীকৃতি ছাড়াই হিন্দুদের মাঝে সিঁদুর জনপ্রিয় ছিল।

নানা অভাব অনটনের স্রোতে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে ওরাওদের ধর্মকেন্দ্রিক আচারগুলো। ধর্মান্তরিত হওয়া ওরাওদের কাছে পূর্বপুরুষদের আমলের প্রথাগুলো আজ কেবলই কুসংস্কার। ফলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে উল্কি আঁকার রেওয়াজটিও। কিন্তু পূজা, উল্কি, সিঁদুর কেন্দ্রিক কাহিনীগুলো কি হারাতে পারে কখনো? বরং তাদের কাহিনীগুলো যুগে যুগে সমৃদ্ধ করবে আদিবাসী সাহিত্যকে। একইভাবে কাহিনীগুলো বেঁচে থাকবে বিশ্বসাহিত্যের মাঝে।

সাপ্তাহিক, ১২ আগস্ট ২০১০

মুল্লুক দেওয়ান ও শালবনের আদিবাসীরা

'যে চায়, সে পায়। যে চায় না, সে পায় না। ও কারো ক্ষতি করে না'— পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে কথাগুলো বলছিলেন বিষ্ণুপুর গ্রামের সত্তর বছর বয়স্ক মোজাফফর হোসেন। একই গ্রামের যুবক নবাবের বিশ্বাস মুল্লুক দেওয়ানের জহুরা (শক্তিকে স্থানীরা জহুরা বলে) এখনো আছে। মুল্লুক দেওয়ানের গল্পশুনে অনেকেই আসে এই মাজারে। তথাকথিত লালসালু বা ধর্ম ব্যবসার মাজার নয় এটি।

গ্রামের রাস্তার দুই পাশে খুবই সাধারণ কায়দায় বাঁধানো দুটি কবর বিশেষ। একপাশে সওদাগর মুল্লুক দেওয়ান। আর অন্য পাশে তাঁর বজরার মাঝির কবর। মুল্লুক দেওয়ানকে গ্রামের সহজ-সরল লোকেরা ডাকে 'সত্যপীর' বলে। প্রখ্যাত লেখক ও কবি আজাদুর রহমান তার প্রকাশিত লেখায় মুল্লুক দেওয়ানকে বলছেন 'মাস্তানা মুল্লুক দেওয়ান'।

মাজারের পাশেই ঘন আমগাছে ঘেরা একটি পুকুর। কথিত আছে এই পুকুরের মাঝখানেই এক সময় ছিল একটি মন্দির। হিন্দু কিংবা মুসলমান সকলেই আসে এই মাজারে। অনেকেই মানত করে, মোমবাতি দেয়। দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা বাসগুলো মুল্লুক দেওয়ান অতিক্রম করে শব্দহীন গতিতে। ড্রাইভার ও যাত্রী সকলেই সালাম দেন বিনীত ভঙ্গিতে। মুল্লুক দেওয়ান নামে কেউ ছিলেন কি ছিলেন না তা জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই গ্রামের সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ লোকেদের। তাদের কাছে মুল্লুক দেওয়ান যে কোনো বিপদে মনে হওয়া প্রথম নাম। শুধু বিষ্ণুপুর নয়, গোটা দিনাজপুরবাসীর কাছে মুল্লুক দেওয়ান 'সত্যপীর'।

মুল্লুক দেওয়ানের মাজার থেকে সোজা দক্ষিণে পিচঢালা পথটি চলে গেছে কালিয়াগঞ্জের দিকে। একেবারে শেষে ভারতের সীমান্ত। সীমান্তের পাশেই উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় ন্যাচারাল শালবন। শোনা যায় এই শালবনকে ঘিরেই চলে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবনযাপন। মুল্লুক

দেওয়ান থেকে আমরাও রওনা হলাম সীমান্তের শালবন আর আদিবাসীদের জীবনপ্রণালী দেখতে।

শ্রাবণ মাস। কিন্তু আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ-বৃষ্টির আয়োজন নেই। পানির অভাবে রাস্তার দু'পাশের ফসলহীন মাঠ ফেটে চৌচির। গ্রামবাসীরা ইতোমধ্যেই বৃষ্টির জন্য করেছে বিশেষ মোনাজাত। কালিয়াগঞ্জ বাজারে পাকা রাস্তাটি শেষ হয়ে শুরু হলো লাল মাটির কাঁচা পথ। যতই সামনে এগুচ্ছি ততই রাস্তার প্রশস্ততা কমে যাচ্ছে।

কিছুদূর চলতেই মিলল এনায়েতপুর বিডিআর ক্যাম্প। ক্যাম্পের খুব সামনেই জলহীন পদ্মফোটা একটি বিশাল বিল। এটি গোবরা বিল। বিলের একপাশ ঘিরে আছে ভারতের কুসমন্ডি থানার কাঁটাতারের বেড়া আর অন্যপাশে চোখজুড়ানো সবুজ শালবন।

এনায়েতপুর গ্রামের সীমান্তঘেষা একটি বাড়িতে ঢুকে কাউকে পাওয়া গেল না। পাশেই ধানক্ষেতে কাজ করছে বেশ কয়েকজন মহিলা। খুব কাছেই সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া। বাঙালি ভেবে তাদের সাথে কথা বলতে রওনা দিলাম ক্ষেতের আইল দিয়ে। বেশ খানিকটা যেতেই পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো বাড়ির মালিক আনন্দ। আমরা থমকে দাঁড়ালাম। মনের মধ্যে অন্যরকম এক ভয় এসে ভর করলো। তার ইসারায় বুঝতে পারলাম ভারতের সীমানায় ঢুকে পড়েছি। জীবন নিয়ে প্রায় দৌড়ে নিজেদের সীমানায় ফিরলাম।

আনন্দসহ বাড়ির অন্যরা জানালো দু'মাস আগেও গোবরার বিলে বিএসএফের গুলিতে মারা গিয়েছে ২ জন। কারা মারা গেল। আনন্দ জানায়, 'এরা গ্রামের না, বাইরের লোক।' এখানের সীমান্তে যারা বিএসএফের গুলিতে মারা যায় তারা অধিকাংশই গ্রামবাসীর অচেনা, অন্য উপজেলা থেকে আসা গরু ও ফেনসিডিলের চোরাই ব্যবসায়ী।

আনন্দের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়লাম সবুজ শালবনের ভিতর। বনের সব রাস্তার আবহ প্রায় একই। যতই গহিনে প্রবেশ করছি ততই নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে চারদিক। মাঝে মধ্যেই কানে আসছে অচেনা পাখির ডাক। হয়তো আমাদের উপস্থিতিই জানান দিচ্ছে অন্যদের।

হঠাৎ থমকে গেলাম। কিসের যেন শব্দ চারদিক থেকে সমান তালে ধেয়ে আসছে। আবার মিলিয়ে গেল। কিসের শব্দ এটি। এই প্রথম

আবিষ্কার করলাম— শালবনে বাতাসে নড়া শালপাতার শব্দ। শব্দ নয় এ যেন পাতার মিছিল।

বনের মধ্যেই দেখা হলো ৫৫ বছরের নাজির হোসেনের সাথে। ফরেস্ট গার্ড সে। তার কাছ থেকে জানা গেল, প্রায় ২৭০০ হেক্টর জমিতে ব্রিটিশ আমলেরও পূর্বে গড়ে উঠেছে এই আদি ও ন্যাচারাল শালবন। বনের মধ্যেই পাওয়া গেল অবাক করা রহস্যময় কিছু গাছ। অজগর সাপ আকৃতির বড় গাছ একটি আরেকটির সাথে পেঁচানো। নাজিরের ভাষায় এটি 'বাদেনা গাছ'। এ বনে এখন তেমন হিংস্র জানোয়ার না থাকলেও যুবক বয়সে নাজির নিজেই এখানে বাঘ দেখেছে। নাজির জানায় বনের মধ্যে ও চারপাশে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওসহ অন্য আদিবাসীদের বসবাস। শিকার ও খাদ্যের জন্য আদিবাসীরা বিচরণ করে এই বনে। ঘন বনের মধ্যে দেখা গেল পাহাড় আকৃতির মাটির ডিবি। দেখে মনে হবে কোনো শিল্পী ভাস্কর্য তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারা তৈরি করেছে এটি। মুচকি হেসে নাজির উত্তর দিল, এটি 'উলির ডিবি'। উইপোকা সারা বনের মধ্যেই তৈরি করেছে এ ধরনের ডিবি।

বনের পথ চেনা যায় কিভাবে। উত্তরে নাজির বলে, 'বেশ কঠিন।' কিছুদিন আগেও পথ চলতে চলতে নাজির হারিয়ে যায়। বনের মধ্যেই একরাত বহু কষ্টে পার করে পরদিন দিক খুঁজে পায়। নাজিরের ভাষায় তাকে 'ভুলায়' ধরেছিল।

কিছুদূর যেতেই বনের মধ্যে চার আদিবাসী নারীর দেখা মিলল। গাছের ডাল কুড়াচ্ছে তারা। কাছে যেতেই দ্রুত সরে যাওয়ার চেষ্টা করলো। আমরা অভয় দিলাম। জানা গেল তারা সকলেই আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের পাহান গোত্রের। মিনি পাহান, সমারী পাহান, রায়মনি পাহান- একে একে নাম বলেলও নাম বলতে রাজি নন 'ছনিয়ার পাহান'। তার ধারণা তার নামটি অন্যদের মতো সুন্দর নয়।

এরা থাকে বনের পাশেই গোদাবাড়িতে। বনের মধ্যে কেন, প্রশ্ন করতেই ছনিয়ার জবাব, 'বাবু, জংলী মানুষ হামরা, কাঠি কুড়াছি'। জানা গেল শুধু লাকড়ি নয়, বন থেকে তারা সংগ্রহ করে নানা জংলী ফল। এখন কম পাওয়া গেলেও এই বন থেকেই তারা সংগ্রহ করে পিয়াল, ভেলা, বেল, বনজাম, ঠলা, জামরুল, রাখাল নাড়ু, বট পিঠালী প্রভৃতি ফল।

এই বনেই তীর, ধনুক আর বল্লম দিয়ে দলবেঁধে আদিবাসী ছেলেরা শিকার করে গুইসাপ, বিজু, খাটাস, খরগোশ প্রভৃতি পশু। তবে শিকারিদের পছন্দ 'বিজু'। এই শালবনে রয়েছে অসংখ্য জংলী আলুর গাছ। এই আলু আশেপাশের আদিবাসীদের পছন্দের খাবার। আশ্বিন কার্তিকে আলু তোলার সময় হলে আদিবাসী মেয়েরা একে অপরকে বলতে থাকে, 'চলা গে কান্দা খরে যাব' (চল, সবাই আলু তুলতে যাই)। আলু তোলা আর শিকার ধরার ধুম পড়ে যায় শালবনে। রাতে চলে হাঁড়িয়া খাওয়া। চলে আদিবাসী নৃত্য। জঙ্গল কেমন লাগে। হেসে হেসে সকলেই বলে, 'জঙ্গল মে ভালো লাগেই লা, ঠাণ্ডা লাগেই লা, গাছকে ছায়ের মে।'

চৌদ্দপুরুষ ধরে এই শালবনই আদিবাসীদের জীবন। এই বনকে ঘিরেই তারা বেঁচে আছে, বেঁচে আছে তাদের সংস্কৃতি। আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ লোককে খুঁজেতে গিয়ে পাওয়া গেল গবিনকে। বনঘেষা ধর্মজান সাঁওতালি গ্রামের মহত সে। গবিনের সাথে যখন কথা হচ্ছিল তখন পাশ থেকে এক মহিলা দাবি করল তার নাম গবিন নয়, 'বাছতা মুরমু'। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও তার পক্ষে বাবা-মার দেয়া



গহীন শালবনে অজগর সাপ আকৃতির পেচানো রহস্যময় এই গাছকে স্থানীয়রা বলে 'বাদেনা'

সনাতন সাঁওতালি নাম ভোলা সম্ভব হয়নি। গবিন জানায়, এক সময় এই পুরো এলাকায় ছিল শুধু আদিবাসীদের বাস। আর এই শালবন ছিল আরো গহিন।

যুবক বয়সে গবিনই একদিন বাঘের কবলে পড়ে। দলের অন্যদের ছোঁড়া ধনুক ও বল্লমের কারণে রক্ষা পায় সে যাত্রায়। গবিন আফসোসের সাথে জানায়, এখন বনও উজার হচ্ছে আর পাল্লা দিয়ে কমছে আদিবাসীদের সংখ্যা। এ দেশে আদিবাসীদের কমে যাওয়ার কারণ কি। খানিক চুপ থেকে গবিন বলেন, 'বাবু, রাগ করবেন না। এ দেশ আগে ছিলো সবার, স্বাধীনের পর হয়েছে মুসলমানের দেশ।'

দরিদ্রতা গবিনকে বাধ্য করেছে সনাতন সাঁওতাল ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হতে। এখন তার আর্থিক কষ্ট নেই। ঘর হয়েছে, ক্ষেত হয়েছে। মিলেছে সন্তানদের চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা। গবিনের মতো ধর্মান্তরিত অন্য আদিবাসীরা সত্যিই কি ভুলতে পেরেছে নিজের জাতিসত্তাকে। পূজার সময় অন্যরা যখন পূজা করে তখন কেমন লাগে। প্রশ্ন করতেই চুপ মেরে যায়। আস্তে আস্তে বলে 'কষ্ট লাগে'।

আনন্দ নিয়ে শালবন দেখতে গেলেও আমরা ফিরছি বহু প্রশ্ন আর অন্যরকম কষ্ট নিয়ে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে সীমান্তের কালো কাঁটাতারের বেড়া, সবুজ শালবন আর কষ্টে ভরা আদিবাসী মুখগুলো। কানে বাজছে গবিনের কথাটি, 'স্বাধীনের পর এ দেশ হয়েছে মুসলমানের দেশ।' মনে মনে ভাবছি, এ দেশ কি কখনো পারবে গবিনের ভুলটিকে ভেঙে দিতে?

সাপ্তাহিক, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯



আদিবাসীদের বিশ্বকাপ ফুটবল ভাবনা

ফুটবলের কথা বলতেই লবানু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলতে পারে না বিশ্বকাপে খেলা প্রিয় দেশের নামটি। বারান্দায় বসা ছিল লবানুর ছেলে কাজল শিং। খেলার কথা শুনতেই সে এগিয়ে আসে। হাসি হাসি মুখে জানায় বিশ্বকাপে তার প্রিয় দলটির নাম 'আর্জেন্টিনা'। শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে না পারলেও জানে মেসির নামটিও।

দিনাজপুরের লোহাডাংগায় আদিবাসী তুরি সম্প্রদায়ের এ গ্রামটির মাহাতো লবানু শিং। বয়স সত্তরের মতো। জানা গেল এক সময়কার দুর্দান্ত ফুটবল খেলোয়াড় সে। স্মৃতির ভাঁজ থেকে লবানু বলতে থাকে ফুটবল খেলা নিয়ে তার সময়ের নানা কথা।

একবার লোহাডাংগার সাথে খেলা হয়েছিল পাশের মুরাদপুরের তুরিদের সাথে। লবানুরা দুই গোলে জিতে সে ম্যাচটিতে। একটি গোল করে লবানু নিজেই। 'ফুটবল' ইংরেজি নাম হওয়ায় এ নামটির সাথে তুরিরা তত বেশি পরিচিত নয়। ফুটবলকে এরা জানে 'বল খেলা' হিসেবে।

এক সময়কার নামকরা খেলোয়াড় হলেও লবানুর বয়সী আদিবাসীরা বিশ্বকাপ সম্পর্কে খুব কমই জানে। তাদের তেমন আগ্রহ নেই বিশ্বকাপ খেলা দেখায়। তাছাড়া অভাব যাদের পায়ে পায়ে খেলা দেখার টেলিভিশন তারা পাবে কোথায়।

বাড়ির ভিতর নজরে পড়ার মতো উঁচু করে তৈরি করা হয়েছে ছোট্ট একটি জায়গা। পাশেই সন্ধ্যাতারা ফুলের একটি গাছ। লবানু জানায় এটি তাদের 'তুলসি থান' বা 'প্রার্থনার স্থান'। সেখানে রঙিন জার্সি পড়ে ভক্তি দিচ্ছে সবানু শিং।

অন্যদিকে গোত্রের তরুণ ও যুবকবয়সীদের কাছে বিশ্বকাপ খেলা না দেখলেই নয়। নকুল শিং, পলাশ শিং, কাজল শিং-এর মতো যুবকরা

বিশ্বকাপ খেলা দেখে গোত্রের রতন শিং-এর বাড়িতে। জায়গা না পেলে খেলা দেখতে কেউ কেউ আবার চলে যায় বাজারের দিকে।

বিশ্বকাপে অংশ নেয়া দেশগুলোর কথা তেমন জানা নেই তুরিদের। কিন্তু আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিলের নাম প্রায় মুখে মুখে। আশেপাশের আদিবাসী গ্রামগুলোর মধ্যে একমাত্র রতন শিং-এর বাড়িতেই টিভি আছে। তাই খেলা দেখতে সকলেই ভিড় জমায় তার বাড়িতেই। বিশ্বকাপের খেলার কারণে এ সময়ে রতনের ইজ্জতও বেড়েছে কয়েকগুণ।

কথা হয় খেলাপাগল তুরি সম্প্রদায়ের কয়েকজন যুবকের সঙ্গে। অভাবের কারণে নিজ পছন্দের দলটির পতাকা কিনতে পারেনি এরা। সে নিয়ে তাদের বেশ মন খারাপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বকাপ নিয়ে উৎসাহের কমতি নেই তাদের মধ্যে। শকিন্ত শিং তুরি ভাষায় বলে, 'আর্জেনটিনা যুদি জিতেএ, তালে খুব আনন্দ কেরবে, হাঁড়িয়া খাবে'। একই দলের অনুসারী নয়ন শিং বলে, 'মেসি বালাক খেলেল পারছে'। পাশ থেকে রাজন শিং চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাজিল জিতেবেএ'।

গোত্রের পলাশ শিং বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে তার চিন্তাকে এখনো স্থির করতে পারেনি। গত সপ্তাহে ব্রাজিলের খেলা তার পছন্দ না হওয়ায় এখন সে আর্জেটিনার খুবই ভক্ত। বিশ্বকাপ ফাইনালে কোন দল জিতবে? এরকম প্রশ্নে আদিবাসী তুরিদের মাঝে তাই হট্টগোল বাধে।

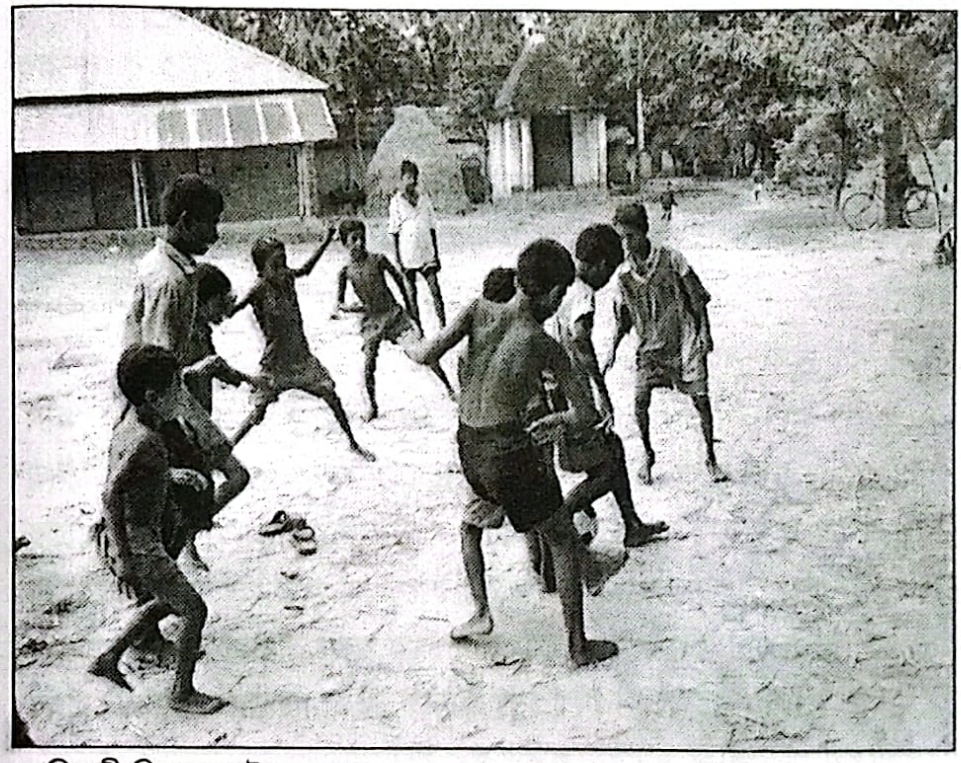
হালজায় গ্রামের কড়া পাড়ায় বিশ্বকাপ নিয়ে কোনো উত্তাপ নেই। বাংলাদেশে টিকে থাকা আদিবাসী কড়াদের ১৯টি পরিবারের মধ্যে ১৬টি পরিবারেরই বাস এখানে। আদিবাসী কড়াদের অধিকাংশই অন্যের জমিতে কাজ করে। কেউ কেউ আবার ভ্যান চালিয়ে যা আয় করে তা দিয়েই কোনোরকমে চালিয়ে নেয় জীবনযাপন। এই গোত্রের মহত জগেন কড়া। জগেন জানালো কড়াদের এ গ্রামটিতে কোনো টেলিভিশন নেই। ফলে বিশ্বকাপ খেলা দেখার আনন্দ থেকেও তারা বঞ্চিত।

কিন্ত কড়া গোত্রের তরুণদের কাছে বিশ্বকাপ নিয়ে উৎসাহের এতটুকু কমতি নেই। নিজ গ্রামে টিভি না থাকলেও পাশের গ্রামে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলা দেখে কৃষ্ণ কড়া, ওদো কড়া, কামান কড়া, কাইচাল কড়া। কড়া সম্প্রদায়ে প্রায় অধিকাংশ তরুণদেরই পছন্দের দল ব্রাজিল। পতাকা নাই কেন? প্রশ্ন করতেই কৃষ্ণ কড়ার জবাব, 'টাকা নাই, তাই পতাকা নাই'।

আদিবাসী কড়াদের এই গ্রামেই রয়েছে একটি ফুটবল টিম। আশেপাশের গ্রামে দলটির বেশ নামডাক। নিজ দলটির বিষয়ে জগেন কড়া বলে, 'বল খেলাল জেবে আজ হামনে টিম হে'। বিশ্বকাপ খেলা দেখায় রঞ্জন কড়া বেশ উৎসাহি। সে জানে না কোন কোন দেশ অংশগ্রহণ করেছে বিশ্বকাপে। কোন দল জিতবে? এ রকম প্রশ্ন করতেই রঞ্জন কড়া চিন্তিত, কি উত্তর দিবে ভেবেই যেন পাচ্ছে না। হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমার মনে হয় ভারত জিতবে'।

বহবলদিঘির ওরাও পাড়ার নিপেন টিগ্‌গা কিন্তু রঞ্জনের মতো নয়। বিশ্বকাপে অংশ নেয়া অনেক দেশেরই নাম জানে সে। ১৯৮০ সালে দিনাজপুর স্টেডিয়ামেও খেলার অভিজ্ঞতা আছে তার। তার মতে ফুটবল সবার জন্য উপভোগ্য একটি খেলা। যারা দেখে তারা যেমন সহজে বুঝে, যারা খেলে তাদের জন্যও সহজ। কোন দলের খেলা পছন্দ প্রশ্ন করতেই পাশ থেকে ভিম লাকড়ার উত্তর, 'সবে আর্জেন্টিনা'।

নিপেন জানালো গ্রামের আদিবাসী ওরাও সম্প্রদায়ের রয়েছে একটি শক্তিশালী ফুটবল টিম। 'টিনপাড়া ফুটবল টীম' বললেই সবাই একনামে চেনে। ফুটবল নিয়ে গোত্রের মহত ওরাও ভাষায় বলে, 'এমা খাদদার বল



আদিবাসী শিশুদের ফুটবল খেলা

ভালো বেজ নার' (আমাদের ছেলেরা ফুটবল ভালো খেলে)। ওরাও যুবকেরা সারা দিন কাজ করে সন্ধ্যা হতেই বেরিয়ে পড়ে খেলা দেখতে। গ্রামের মধ্যে কোনো টিভি না থাকায় সবাই ভিড় জমায় প্রায় ২ কিলো দূরের বাজারে।

মহেশপুর গ্রামের আদিবাসী সাঁওতালরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বেশ অগ্রসর। বিশেষ করে যারা ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়েছে তাদের অনেকের বাড়িতেই রয়েছে টেলিভিশন। বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে কথা হয় গোত্রের মহত শাহ বাছকির সঙ্গে। সাঁওতাল ভাষায় সে বলে, 'বল এনেক এটি মজ, হর ডি মছকো এনেক দাড়িয়া (ফুটবল খেলা আমাদের খুবই পছন্দের, সাঁওতালরা ভালো বল খেলে)।' অন্য কোনো দেশের নাম বলতে না পারলেও এ গ্রামের সাঁওতালরা হর হর করে বলে দেয় ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার নামটি। সাঁওতালি তরুণদের মুখে মুখে মেসির নাম। গোত্রের দালু সরেনের মতে নামের উচ্চারণ সহজ হওয়াতেই মেসি এখানে বেশ জনপ্রিয়। আবার মুগলী মুরমুর মতো ব্রাজিলিয়ান সমর্থকরা ব্রাজিলের কাকাকে বলছে 'কারকা' নামে। বাছকি জানায় বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার দিন গোটা গ্রামে চলবে আনন্দ উল্লাস, চলবে হাঁড়িয়া খাওয়া।

পিপল্লা গ্রামের আদিবাসী ভুনজার আর কাশিডাঙ্গা গ্রামের মুশহর সম্প্রদায়ের লোকেরাও পিছিয়ে নেই বিশ্বকাপ খেলা দেখার আনন্দ থেকে। শহরের নিকটবর্তী গ্রাম হওয়াতে এখানকার আদিবাসী গ্রাম দুটিতে উড়ছে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার ছোট্ট ছোট্ট পতাকা। চাঁদা দিয়ে পতাকা কিনেছে ভুনজার আর মুশহর সম্প্রদায়ের আদিবাসী যুবকেরা। একইভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে বিশ্বকাপ ফাইনালের আনন্দ উদ্‌যাপনের।

বিরল উপজেলার একজন ক্রীড়া সংগঠক শফিকুল আজাদ মণি। তিনি জানালেন এ অঞ্চলে ভালো ফুটবল খেলোয়াড়দের তালিকায় আদিবাসীদের নামই শীর্ষে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন টিনপাড়া ফুটবল টিমটির সফলতার কথা। তিনি মনে করেন সঠিক নির্দেশনা আর সহযোগিতা পেলে আদিবাসীদের মধ্য থেকে উঠে আসতে পারে দেশের প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড়। তিনি জানালেন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখার আনন্দ বাতাস এ অঞ্চলের আদিবাসী মানুষগুলোরও মন ছুঁয়েছে।

বিশ্বকাপ খেলা উপলক্ষে দিনাজপুরের সংসদ সদস্য ও চেয়ারম্যানেরা অনুদান হিসেবে বিভিন্ন গ্রামে খেলা দেখতে বিতরণ করেছেন টেলিভিশন। কিন্তু বরাবরের মতোই তাদের নেক দৃষ্টি পড়েনি আদিবাসী গ্রামগুলোতে। ফলে জনপ্রতিনিধিদের কোনো টেলিভিশনই পৌঁছায়নি পিছিয়ে পড়া আদিবাসী গ্রামগুলোতে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ অঞ্চলের আদিবাসীরা পিছিয়ে নেই বিশ্বকাপ খেলা দেখায়। প্রযুক্তির কল্যাণে তীর-ধনুকের মানুষদের দৃষ্টিও আজ বিশ্বকাপের দিকে। রাতভর অন্যগ্রামে গিয়ে খেলা দেখা আর দিনের বেলায় প্রীতি ম্যাচের আয়োজন চলছে আদিবাসী গ্রামগুলোতে। আদিবাসীদের মুখেও উচ্চারিত হচ্ছে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার নাম। বিশ্বকাপ ফুটবলের তেমন কোনো ইতিহাসই জানে না এরা। তাদের ভালো লাগা ফুটবলে। বিশ্বকাপ ফুটবলের আনন্দ তাই ঢেকে দিচ্ছে দরিদ্রতা আর নানা বৈষম্যের স্বীকার আদিবাসীদের চাপা কষ্টগুলোকে।

সাপ্তাহিক, ২৪ জুন ২০১০

মাহালিদের বিশ্বাস ও নানা আচার

একপাশে একটি মসজিদ আর অন্যপাশে গির্জা। মাঝ বরাবর সরু রাস্তাটি চলে গেছে মাহালি পাড়ার দিকে। এলোমেলো ভাবে বাঁশের তৈরি ঝুড়ি আর ডালাগুলো পড়ে আছে এদিক-ওদিক। কোনো কোনো ঝুড়ি বা ডালা পুরোপুরি তৈরি হওয়া, কোনোটি আবার শুরু হয়েছে মাত্র। কাজ ফেলে সবাই ভিড় জমিয়েছে একটি বাড়িতে। বাড়ির ভিতর মহিলারা কান্নার মাতন তুলেছে। সবার চোখ ভিজে উঠেছে কান্নার জলে।

এ পাড়ার সবচেয়ে বয়ঃবৃদ্ধা জুলিয়া হেমব্রন। বয়স একশো পাঁচের মতো। গতরাতে জুলিয়া মারা যায় হঠাৎ করেই। গোটা পাড়া হয়ে যায় স্তব্ধ। সবার মাথার ওপর থেকে যেন সরে গেছে বটগাছের ছায়াটি।

দিনাজপুরের মিশন এলাকার মাহালি পাড়া এটি। মাত্র ২৫টির মতো মাহালি পরিবারের বাস এখানে। আমরা যখন পৌছাই গোত্রের মহত বা মানঝিসহ পরিষদের অন্যরা তখন নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ সবাইকে ডেকে আনছে। কেউবা চলে গেছে কবর খুঁড়তে।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাচ্ছেন গোত্রের জনাকয়েক মহিলা। গোসল শেষ হতেই আত্মীয়স্বজনেরা ভিড় জমায়। পালা করে মৃতের গায়ে হলুদ মাখে। মাহালি সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের বিশ্বাস একদিনের পর আর কোনো দিন কেউ মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করতে পারবে না। আর সে কারণেই মৃতের গায়ে হলুদ মাখা হয়।

এরপর মৃত ব্যক্তিকে সাদা কাপড় পরিয়ে সুগন্ধি দেয়া হয়। গোত্রের মানঝি আব্রাহাম হাজদা জানালো এক সময় মৃতের পরবর্তী জীবনে যাতে কোনো অভাব না হয় সে কারণে নাকি কাপড়ের ভিতরে টাকা পয়সা দিয়ে দেয়া হতো। একই সাথে দেয়া হতো মৃতের পছন্দের কিছু ব্যবহার্য জিনিস।



মাহালি নারী

মাহালিদের মৃত্যুর পরের আচার ও বিশ্বাসগুলো অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন। গোসলের পর কবরে নেয়া হয় মৃতকে। তখন মহিলারা যেতে পারে গ্রামের শেষসীমান্ত পর্যন্ত মাত্র। লাশ নিয়ে যাওয়ার পর গোত্রের মেয়েরা পুকুরের পানিতে তেল ও সিঁদুর মিশিয়ে গোসল সেরে নেয়। পানিতে তেল ও সিঁদুর যদি সহজেই মিশে যায়— তাহলে তারা বিশ্বাস করে এটি মৃতের স্বাভাবিক মৃত্যু। আর তা না হলে ধরে নেয়া হয় এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু।

আমরা অবাক হয়ে শুনতে থাকি একটি আদিবাসী জাতির আচারগুলোর কথা। মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তির জন্য মাহালিরা কবরে মৃতের শরীরে ফুল ছিটায়। অতঃপর সাড়ে তিন হাত কবরে বাঁশের মাচা দিয়ে কবর দেয়া হয় । ঘণ্টা তিনেক পর জুলিয়া হেমব্রনকেও কবর দেয়া হলো সেভাবেই।

কবর দিয়ে ফেরার পথে মানঝি আরো জানালো এক সময় নাকি মাহালি সম্প্রদায়ে মৃতদেহ দাহ করা হতো। শ্মশানে মৃতদেহ নেয়ার সময় একটি ডিম ভাঙা হতো। মাহালিদের কাছে ডিম আমিষের প্রতীক। পরবর্তী জীবনে মৃতের যেন আমিষের অভাব না ঘটে সে বিশ্বাস থেকেই এই আচার। কাঠের উচ্চমূল্যসহ নানা কারণে এ দেশের মাহালিরা এখন আর মৃতদেহ দাহ করে না।

মাহালি সম্প্রদায়ে মৃত্যুর পর দশ দিন ধরে মৃতের বাড়িতে পালন করতে হয় অশৌচ। এ সময় পরিবারের সদস্যদের চুল, দাড়ি কাটা একেবারেই নিষেধ। দশ দিন পর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করে তবেই কাটতে হয় চুল, দাড়ি।

শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানকে মাহালি ভাষায় বলে 'ভাণ্ডান'। ভাণ্ডানের আগের দিন 'উমূল আদের' অনুষ্ঠান পালন করে এরা। ঐদিন মৃতের আত্মীয়স্বজনসহ গোত্রের লোকেরা গ্রামের দুই প্রান্তে দুটি মোমবাতি জ্বালিয়ে মৃত ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে স্মরণ করে। মোমবাতির আলো যদি একটি অপরটিকে আলোকিত করে তবে মাহালিরা মনে করে মৃত ব্যক্তির আত্মা তার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে গেছে। ফলে পৃথিবীতে তার নামে আর কোনো অভিযোগ থাকে না।

খানিক চুপ থেকে মানঝি আবারো বলতে থাকেন। ভাণ্ডান-এর দিন মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে ভোজসভার আয়োজন করা হয়। প্রথানুসারে ঐদিন মৃতের আত্মীয়স্বজনরা চাল, হাঁস, মুরগি, শূকর ইত্যাদি ভোজের সামগ্রী নিয়ে আসে মৃতের বাড়িতে। মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে করা হয় বিশেষ প্রার্থনা। ভোজের সময় খাবারের থালায় মৃতের উপস্থিতি লক্ষ করে মাহালিরা। এরা মনে করে ঐদিন মৃত ব্যক্তি শেষবারের মতো খাবার খেতে পৃথিবীতে আগমন করে।

কথা বলতে বলতে আমরা আবারো চলে আসি মাহালি পাড়াতে। বড় একটি পাকুরগাছের নিচে আয়েস করে বসে পড়ে গোত্রের মানঝি, দাও হাজদা, জয়নিকা হেনব্রনসহ কয়েকজন। আমরাও শরীরটাকে হেলে দেই গাছের ছায়ায়।

হেমব্রন বা হাজদা অর্থ কি? এরকম প্রশ্নে সবার দৃষ্টি আমাদের দিকে। খানিকটা ভড়কে যাই আমরা। কিন্তু দাও হাজদা উত্তর দিতে থাকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই মাহালিরা মনে করে তাদের গোত্রের সাথে পেশার সম্পর্ক আছে। সে কারণেই এক সময় সরেন গোত্রের লোকেরা সিপাহী সৈনিকের কাজ করতো বলে তাদের বলা হতো সরেন সিপাহী। একইভাবে কিস্কু গোত্রের লোকেরা রাজপাট চালতো বলে তাদের বলা হতো কিস্কুরাজ। মুরমু গোত্রের লোকেরা পুরোহিতের কাজ করতো বলে তাদের মুরমু ঠাকুর বলা হতো। হেমব্রনরা কুমার বা দেওয়ানের কাজ করতো। বাস্কে গোত্রের লোকেরা বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ব্যবসা করতো। হাজদা ও টুডু গোত্রের লোকেরা লোহার জিনিস তৈরি করতো এবং উৎসবের সময় বাদ্যযন্ত্র বাজাতো। এসব বিশ্বাস ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে মাহালিদের জীবন থেকে। পূর্বে মাহালিদের ৩৪টি গোত্র

পরিচয় থাকলেও বর্তমানে শুধু হেমব্রন, হাঁজদা, বাস্কে, মুরমু, টুডু, সরেন, বেসরা, মার্ডি, কিস্কু গোত্রগুলোই টিকে আছে।

পূজা-পার্বণের কথা উঠতেই জয়নিকা হেমব্রন জানালো 'সিঞ বোঙ্গা' বা সূর্যদেবী পূজার কথা। ঐতিহ্যগতভাবে মাহালিরা সূর্যের উপাসক। এ সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা বারো বছর অন্তর গ্রামের মঙ্গলের জন্য সূর্যিদেবীর পূজা করে থাকে। সাধারণত বৈশাখ মাসে এ পূজা করতে হয়। এ সময় মাহালিরা জাহের থান বা প্রার্থনার স্থানে সূর্যিদেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেয়। অতঃপর বলির মাংস রান্না করে সকলকেই খাওয়ায়। একই সাথে চলে হাঁড়িয়া বা চুয়ানি খাওয়া।

দাও হাজদা জানলো দেবী মনসার কথা। মনসার শক্তিতেই একসময় মাহালিরা সাপে কাটা রোগী ভালো করতো অনায়াসে। এখনো মন্ত্র পড়ে সাপের বিষ নামাতে পারে এ গোত্রের মানঝি আব্রাহাম। কিভাবে বিষ নামাতে হয়? প্রশ্ন করতেই আব্রাহাম উচ্চকণ্ঠে পড়তে থাকে মন্ত্র :

'কারিকুলমু আলেক ডার
চৌদ্দ সাপিণীর চর্বি মার
মানুষকে খায়—
হাড়ে কুড়ে বিষ নাই
কি কি সাপতো নাম।
গমা, গোফলা চিতিচুয়া, চিতি চিমটিয়া
জলপিড়ে জলপিড়ায় গরু আত্রে গেয়ানি
কালিদো কালি নিচিন কালি
কেবল উরদাই, কেবল মুরদাই।'

ভাদ্র মাসে করতে হয় মনসা পূজা। এ পূজায় ঘরের বাইরে মনসা দেবীর মূর্তি তৈরি করে তার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয়। আর কোনো পূজা বা উৎসব আছে কিনা? প্রশ্ন করতেই দাও হাজদা প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলতে থাকে কারমা, গারয়া, মাঘসিম, শারুল, জিতিয়া, এরক্, লবান প্রভৃতি।

শিশুর জন্মকালীন সময়ে আদিবাসী মাহালিরা জন্মস্থানে অন্যকোন গর্ভবতী নারী ও যুবতী মেয়েদের প্রবেশ করতে দেয় না। শিশুর জন্ম হওয়া মাত্রই তাকে শুকনো কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। অতঃপর মায়ের জরায়ু থেকে গর্ভফুল বের না হওয়া পর্যন্ত দাই শিশুর নাড়ি কাটেন না। ছেলে সন্তান হলে মাহালিরা বাঁশের টুকরো ছাল বা তীরের ধারালো অংশ দিয়ে নাড়ি

কাটে। এরা বিশ্বাস করে তীরের ধারালো অংশে নাড়ি কাটলে ছেলে সাহসী ও নির্ভীক হবে। আর বাঁশের ছাল দিয়ে নাড়ি কাটলে ভবিষ্যতে ছেলেটি মাহালিদের আদি পেশা বাঁশ-বেতের কাজের সাথে যুক্ত থাকবে। আর মেয়ে শিশুর নারী কাটা হয় শুধুই শামুকের খোলসের ধারালো অংশ দিয়ে।

ক্রমেই আমাদের গল্প জমে ওঠে। জয়নিকা জানালো বিয়ে নিয়ে মজার সব তথ্য। মাহালিদের বিয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানটি হয় তিন দিনব্যাপী। এক সময় এ অনুষ্ঠান চলতো ৭ থেকে ৯ দিন পর্যন্ত। আলাদাভাবে বর-কনের বাড়িতে হয় গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। মাহালিদের ভাষায় এটি 'শুনুম শাসাং ওজক্'। গায়ে হলুদ দেয়ার পর থেকে বর বা কনে বাড়ির বাইরে যেতে পারে না। আত্মীয়স্বজন বর-কনেকে হলুদ দেয় গান গাইতে গাইতে। বলতে বলতেই গায়ে হলুদের একটি গান ধরে জয়নিকা :

'খুদি গুড়া বাবা পুষে বাড়হাইলাম
বছরও দিনে বাবা হেরিগেল।'

গানের অর্থ : ছোটবেলা থেকে চাল খুদ খেয়ে বড় হলে, আর এখন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে।

গায়ে হলুদের পর বিয়ের মূল পর্ব শেষে হয় নববধূ বরণ পর্বটির সাথে। মাহালিরা একে 'বাহু পরছ্যও আদের' বলে। এ অনুষ্ঠানে বরের মা একটি ডালায় আমপাতা, দূর্বা ঘাস, কিছু ধান নিয়ে নববধূকে গুড় বা মিষ্টি খাইয়ে বরণ করে নেয়।

আবার বরের বাড়িতে ভোজের দিনে আত্মীয়স্বজনেরা উপহার নিয়ে আসে। উপহার প্রদানের অনুষ্ঠানকে মাহালিরা 'বাঁধাপণ' বলে। বাঁধাপণ হিসেবে দেয়া হয় সংসারের কাজে ব্যবহার্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। বাঁধাপণ দেয়ার পদ্ধতিটি বেশ অন্যরকম। প্রবীণ ব্যক্তিকে যখন বর-কনে ডান হাত মুঠিবদ্ধ করে মাথায় হাত ছুয়ে ডবক্ (প্রণাম) করে তখন ঐ ব্যক্তি আশীর্বাদস্বরূপ উপহার তুলে দেয় বর-কনের হাতে। উপহার প্রদানকারী যদি বর-কনের ছোট হয় তাহলে সে বর-কনেকে ডবক্ করে।

সন্ধ্যা নামতেই মাহালিপাড়ার সবাই চলে যায় নিজ নিজ ঘরে। মৃতের বাড়িতে বেজে ওঠে শঙ্খ আর উলু ধ্বনী। নির্ঘুম চোখগুলো জেগে থাকে নানা স্মৃতিচারণের দমকা বাতাসে।

সাপ্তাহিক, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০



সাঁওতালি বিশ্বাসে নানা কাহিনী

বাড়িটির চারপাশ একেবারেই থমথমে। কোনো মানুষজনের দেখা নেই। মূল ফটকের পাশেই উঁচু করে তৈরি করা হয়েছে একটি প্রার্থনার স্থান। আকার দেখে বোঝা যায় এটি গ্রামের একমাত্র বোঙ্গা। আদিবাসী সাঁওতালরা তাদের প্রার্থনার স্থানকে বোঙ্গা বলে। দরজায় কড়া নাড়তেই বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে আসে মধ্যবয়স্ক এক যুবক। নাম জানালো সানজিলা। বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই দৃশ্য যেন পাল্টে যায়। একদিকে কয়েকজন নারী-পুরুষ আয়েস করে খাচ্ছে চুয়ানি। অন্যপাশে কয়েকজন রান্নায় ব্যস্ত। এরই মধ্যে এক মহিলা বারান্দায় ঘুম পাড়াচ্ছে তার বাচ্চাটিকে। আধো বাংলা আধো সাঁওতালি ভাষায় চলছে সে চেষ্টা।

দিনাজপুরের মহেশপুরের এ সাঁওতালপাড়ার মহতের নাম বাঠু সরেন। এটি তারই বাড়ি। মাটি আর ছনের তৈরি বেশ কয়েকটি ঘর নিয়ে গোলাকৃতির বাড়ি এটি। বাঠু জানালো বাঙালি নারীদের মতোই সাঁওতাল নারীদের প্রতিদিন ঘরের কাজ সারতে হয়। তবে তাদের সম্প্রদায়ে নারীর প্রাধান্য বেশ উঁচুতে। ফলে গোত্রে নারী নির্যাতনের বিষয়টি নেই বললেই চলে। তাদের পূর্বপুরুষদের আমল থেকে প্রচলিত বহু কাহিনীতেও নারীকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এমনই একটি সাঁওতালি কাহিনী বলেন বাঠু সরেন।

গভীর অরণ্যে শিকারে যাচ্ছিল এক সাঁওতাল যুবক। বনের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখায় মৃত্যুমুখে পড়ে এক বিষধর সাপ। সাপটি যুবকটির কাছে প্রাণভিক্ষা করে। সাপটির জন্য যুবকটির মায়া হয়। সে সাপটিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়। মৃত্যু থেকে উদ্ধার পেয়ে সাপটি উল্টো সাঁওতাল যুবকটিকেই গিলে খেতে চায়। যুবকটি সাপের এরকম আচরণে হতবাক হয়ে যায়।

তর্ক ও বিতর্কের পর উভয়েই মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যায় বটগাছ, গরু

আর নদীর কাছে। সব শুনে নদী বলে, সাপ যদি যুবককে খেয়ে ফেলে তবে অনৈতিক কিছু হবে না। সে আক্ষেপ করে বলল, যে নদী মানুষের প্রাণ বাঁচায়, তৃষ্ণা মেটায় সে নদীতে কি মানুষেরা রাজ্যের ময়লা ফেলছে না! নদীর কথায় সাপ বেশ খুশি হয়। এরপর তারা যায় বটগাছের কাছে। বটগাছ বলল, সাপের ঐ কাজ অনৈতিক তো নয়ই বরং মানুষের ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, যে বৃক্ষের কাছ থেকে মানুষ শত উপকার পায় সে বৃক্ষ কি মানুষে কেটে উজাড় করে না! এবারও সাপ বেশ আনন্দিত হয়। সবশেষে যুবক আর সাপ যায় গরুর কাছে। গরু বলল, সাপের পক্ষে সাঁওতালি যুবককে গিলে খাওয়াই ঠিক হবে। কারণ যে গরু দুধ দেয়, চাষাবাদে সাহায্য করে, তাকেও মানুষ জবাই করে খেয়ে ফেলে। সবার কথা শুনে সাঁওতালি যুবকের জীবন বিপন্ন। কিন্তু সাপ বেশ খুশি। এবার সে যুবককে খেয়ে ফেলতে পারবে।

এদিকে স্বামীর জীবন রক্ষায় বিচারের এ দীর্ঘ সময়ে সাঁওতালি নারী শিখে নেয় কিছু মন্ত্র। সে মন্ত্রের জোরেই সে সাপটিকে মেরে ফেলে। এভাবেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় সাঁওতালি যুবক।'

আজো সাঁওতালি গাঁয়ে মায়েরা তার সন্তানদের শোনায় এ কাহিনীটি।

চুয়ানি খেতে খেতে বাড়ির মধ্যে কয়েকজন পরিকল্পনা করছিল করম উৎসবের। সাঁওতালরা করম উৎসবে আদিবাসী কড়াদের মতোই গাছের পূজা করে থাকে। তবে এ উৎসব নিয়ে তাদের মিথটি একেবারেই ভিন্ন। সানজিলার জবানিতে শুনি করম রাজার কাহিনীটি।

'করম আর ধরম দুই ভাই। লোকে ডাকে কর্মু আর ধর্মু বলে। কর্মু চাষাবাদ করে খায়। আর ধর্মু মেতে থাকে ব্যবসা নিয়ে। দুই ভাই পাশাপাশি বাড়িতে থাকলেও খায় ভিন্ন। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথি। উৎসবের মাস। কর্মু খুবই ঘটা করে তার বাড়িতে উৎসবের আয়োজন করল। কিন্তু সে অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয় না ধর্মুকে ।

ধর্মুও কম যায় না। সে ব্যবসায়ী লোক। অন্য আরেকদিন সেও ঘটা করে বাড়িতে উৎসবের আয়োজন করে। কিন্তু কর্মুকে কিছুই জানায় না।

কর্মু ছিল আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান। দেবতা। তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে অন্য মূর্তিতে রূপ নিলেন। অতঃপর আত্মগোপন করে রইলেন ধর্মুর বাড়ির খিড়কি দরজার ঠিক পাশেই।

ধর্মুর বাড়িতে তখন ভোজের জন্য ভাত রান্না চলছে। রাতের অন্ধকারে ভাতের ফেন ছুঁড়ে দিল ধর্মু। আর সে গরম ফেন গিয়ে পড়ল কর্মু দেবতার গায়ে। ঝলসে গেল কর্মুর সারা শরীর। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে চলে আসে কাসাই নদীর ধারে। গঙ্গার শীতল জলে তার যন্ত্রণা উপশম করে।

কর্মুর অভিশাপে ধর্মু নিঃস্ব হলো। সবকিছু হারিয়ে সে কর্মুর ঘরেই কাজের লোক হয়ে কাজ করতে থাকে। অনেক দুঃখ-কষ্টের পর ধর্মু-কর্মুর কৃপা লাভ করে। দুই ভাইয়ের মিলন হলো। করম গাছের ডাল ছুঁয়ে দুই ভাই শপথ করল;

'আমার করম
আমার ধরম।'

এ ঘটনার পর থেকে সাঁওতালরা করম উৎসব পালন করে আসছে।

করম উৎসবের কথা বলতে বলতে সবাই চুয়ানি পানে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে হাঁড়িয়া ও চুয়ানি। হাঁড়িয়া কিছুটা ঘোলা দেখালেও চুয়ানি একেবার স্বচ্ছ পানির মতো। চুয়ানির মতো তামাকপাতাও সাঁওতালদের কাছে প্রিয় ও পবিত্র। তামাকপাতার প্রচলন নিয়ে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে প্রাচীন এক কাহিনী। মহত জানালো কাহিনীটি।

'এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছিল এক কন্যা। অভাবের কারণে তিনি তার



সাঁওতালি নারীদের হাতে প্রিয় পানীয় চুয়ানী

কন্যাকে বিয়ে দিতে পারছিলেন না। ফলে অবিবাহিত অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের কন্যাটি মৃত্যুবরণ করে। তার মৃতদেহ চিতায় ভস্মীভূত হওয়ার পর ভগবান চান্দো ভাবলেন, আহা! আমি মেয়েরূপে তাকে পৃথিবীতে পাঠালাম অথচ কেউই তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করল না। ভগবান ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তাকে এবার এমন বস্তু করে পৃথিবীতে পাঠাবেন যেন সবাই তাকে সর্বক্ষণ আদর করে।

ভগবান চান্দোর ইচ্ছায় সে ব্রাহ্মণ কন্যার চিতাভস্মের ওপর গজালো তামাকপাতা'।

তামাকপাতার মতো সাঁওতালদের হাঁড়িয়ার কাহিনীটি বলতে থাকে মহত।

'পৃথিবীতে মানব-মানবী তৈরি হলো। সাঁওতালদের ভাষায় পিলচু হড়ম ও পিলচু বুড়ি। একদিন এরা হিহিড়ি পিহিড়ি দ্বীপে বসতি করল। ঠাকুর জিয়োর শুভদৃষ্টি সব সময় থাকলো তাদের ওপর। একদিন মানুষবেশে ঠাকুর জিয়ো তাদের শিখিয়ে দিয়ে যায় হাঁড়িয়া তৈরির সকল পন্থা। সেই সাথে আরো নির্দেশ দিয়ে যান হাঁড়িয়া তৈরির পর তাঁকে কিছুটা উৎসর্গ না করে যেন তারা তা স্পর্শ না করে। হাঁড়িয়া তৈরি হলো। তারা তা খেয়ে নেশায় বুদ হয়ে পড়ে রইল। সংজ্ঞা ফিরে এলে তারা উপলব্ধি করলো তারা মানব-মানবী হয়ে গেছে।'

এ কারণেই সাঁওতালসহ আদিবাসীদের কাছে হাঁড়িয়া পবিত্র পানীয়।

অভাবের কারণে মহেশপুরে অনেক সাঁওতাল পরিবারই গ্রহণ করেছে খ্রিস্টান ধর্ম। ফলে হাঁড়িয়া বন্ধ না হলেও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাদের বাপদাদার আমলের আচারগুলো। এ গ্রামের মহত বাঠু প্রাণপণ চেষ্টা করছেন নিজেদের সাঁওতালি জাতির আচার সংস্কৃতিগুলোকে টিকিয়ে রাখতে। দুঃখ করে বাঠু বলেন, 'অভাবের সাথে সাথে সাঁওতালরা বিক্রি করে ফেলছে নিজেদের জাতি সত্বাটুকু।'

ফেরার পথে নানা প্রশ্ন ভিড় করে মনে। বাঠু কি পারবে গোত্রের জাত ধর্মকে রক্ষা করতে? নাকি প্রকৃতিই বাঁচিয়ে রাখবে প্রাকৃতিজনদের।

সাপ্তাহিক, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০

গল্পের মতো মিথগুলো

মাঘের শীতে কাঁপছে গোটা দেশ। এরই মধ্যে একটি খবর চমকে দেয় সবাইকে। এবার বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে এ দেশ থেকে। দেশের আনাচে কানাচে এই নিয়ে তাই চলছে তুমূল আলোড়ন, চলছে গ্রহণ দেখার নানা আয়োজন। আবার ১০৫ বছর পরে এ দেশ থেকে দেখা যাবে এরকম সূর্যগ্রহণ। তাই গ্রহণ দেখাটা রূপ নিয়েছে রীতিমতো উৎসবে।

সূর্যগ্রহণের দিনে দিনাজপুরের হালজায় গ্রামে ঢুকতেই আমরা হতবাক হয়ে যাই। চারদিকে মাদল, ঢোল আর আদিবাসী ভাষায় চিৎকারের শব্দ। আমরা ভাবছি কোনো পূজার আনুষ্ঠানিকতা চলছে হয়তো। কিন্তু গ্রামের ভিতরে ঢুকতেই দেখি অন্য দৃশ্য। গোটা পাড়ার সকলেই ধূপ জ্বালিয়ে, মাদল-ঢোল বাজিয়ে, বাড়ির চালে পানি ছিটিয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'মামা, গাহানা ছাড়!'

এ গ্রামটিতে কড়া সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের বাস। সূর্যগ্রহণ চলায় গোটা পাড়ার সকলেই উপোস। উপোস অবস্থাতেই এই লোকাচার উৎসবে অংশ নেয়াই নিয়ম। কেন এই সূর্যগ্রহণ হয় সে বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো কড়াদের রয়েছে আদি বিশ্বাস ও কাহিনী। গোত্রপ্রধান বা মহত জগেন কড়া বলতে শুরু করল সে কাহিনীটি।

'মানবজাতি একবার খুবই অভাবের মধ্যে পড়ে। মানবজাতিকে বাঁচানোর জন্য চাই ধান। চন্দ্র এবং সূর্য মানুষের জন্য ধান দিতে অনুরোধ করে দোসাদ দেবতাকে। তাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে দোসাদ দেবতা ধান দেয় মানুষকে, তবে আবার ফেরত দিতে হবে এই শর্তে। কিন্তু সে বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মানবজাতি সে ধার আর পরিশোধ করতে পারে না। চন্দ্র ও সূর্য মানবজাতির পক্ষে সেই ধান ধার নিয়েছিল বলে দোসাদ দেবতা এখনো সুযোগ পেলেই চন্দ্র ও সূর্যকে আক্রমণ করে। এতে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ঘটে।'

এ কারণেই কড়ারা মনে করে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় মানবজাতির দায়িত্ব তাঁদের বাঁচাতে ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করা।

চন্দ্র ও সূর্য কড়াদের মতো ওরাওদেরও দেবতা। ওরাও ভাষায় বিড়ি নাদ ও চান্দু নাদ। চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি নিয়ে ওরাও বিশ্বাসে আছে প্রাচীন এক কাহিনী। বহবলদিঘির ওরাও গ্রামের মহত নিপেন টিগ্গা আধো কুরুক ও আধো বাংলায় জানালো কাহিনীটি—

'ধরমেশ যখন পৃথিবী সৃষ্টি করল তখন আকাশ ও মাটি ছিল খুবই কাছাকাছি। মানুষ চলাফেরা করার সময়ই আকাশ মাথায় ঠেকতো। একবার মানুষের কোনো এক অপরাধে আকাশ উপরে উঠে গেল। এতে চলাফেরায় মানুষের সুবিধা হলেও সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

বনের মধ্যে ছিল এক মহুয়া গাছ। সে গাছে ফুল যতক্ষণ ফুটে থাকতো ততক্ষণ পৃথিবী আলোকিত থাকতো। আর যখন ফুল শুকিয়ে যেত তখন আবার অন্ধকার নেমে আসতো।

সবাই ভাবল, গাছটিই অন্ধকারের মূল কারণ। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, গাছটিকে কেটে ফেলে আলো উদ্ধারের।

গাছটিকে কাটা হলো। কিন্তু তারপরও সেটি মাটিতে পড়ছে না। দৈববাণীর মাধ্যমে জানা গেল গাছটিতে রয়েছে চিলের বাসা। চিলটিকে না মারলে গাছটি মাটিতে পড়বে না। তাই হলো। চিলটিকে মারার পর পরই গাছটি মাটিতে পড়ে গেল। পড়ার শব্দে কেঁপে উঠল গোটা পৃথিবী।

সে দেশের রাজা ভাবল, শত্রুরা তার রাজ্য আক্রমণ করেছে। তিনি সৈন্য নিয়ে এসে দেখলেন মহুয়া গাছটি কাটা। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে শাস্তির হুকুম দিলেন। উভয় পক্ষের সাথে চলল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। রাজার সৈন্য পরাজিত হলো।

অতঃপর গাছটিকে দুই ভাগ করে কাটা হলো। দেখা গেল নিচের দিকের বড় অংশটিতে সূর্য আর উপরের দিকের ছোট অংশটিতে চন্দ্র।

কিন্তু তাদের জীবন দান হবে কীভাবে?

আবারও দৈববাণী এলো। এক চাষীর আদরের পুত্রকে চুরি করে এনে হত্যা করে তার রক্ত ঢেলে দেয়া হলো গাছের কাটা অংশে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্য জীবিত হয়ে আকাশে উঠে গেল।'

সে সময় থেকেই ওরাওরা মনে করে সূর্য পুরুষ এবং সে বেশি রক্ত

পান করেছিল বলে তেজী ও লাল। একইভাবে চন্দ্র মহিলা এবং সে কম রক্ত পান করেছিল বলে স্নিগ্ধ ও সাদা।

মহেশপুরের সাঁওতাল গ্রামের মহত দালু সরেন। এরা একে অপরকে ডাকে 'হর' বলে। 'হর' অর্থ 'মানুষ'। এদেরও আদি দেবতা সূর্য। সাঁওতালি ভাষায় 'সিং বোঙ্গা'। সূর্য পূর্বদিকে ওঠে বলেই পূর্বদিক সাঁওতালদের কাছে পবিত্র। তাই পূজাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এরা পূর্বদিকে মুখ করে বসে। সূর্য-চন্দ্র ছাড়াও পৃথিবী সৃষ্টি বা সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আদিবাসী সাঁওতালদের প্রচলিত ধারণাটি বেশ অন্যরকম। গোত্রের দালু সরেন জানালো কাহিনীটি।

'পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে চারদিকে ছিল শুধু পানি আর পানি। পানির অনেক নিচে ছিল মাটির অস্তিত্ব। ঠাকুর জিয়ো পৃথিবী সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি পানির মধ্যে কাঁকড়া, কুমির, বোয়াল, কাছিম, কেঁচোর মতো জীবের আবির্ভাব ঘটালেন। কিন্তু এতেও তার সন্তুষ্টি আসলো না। অতঃপর তিনি মাটি থেকে এক জোড়া মানব-মানবী সৃষ্টি করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! যখনই তিনি তাদের ভিতর জীবন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখনই আকাশ থেকে আজব এক ঘোড়া এসে মানব-মানবীর মূর্তিগুলোকে খেয়ে



সূর্যকে ভক্তি দিচ্ছে সুনিয়া কড়া

ফেলে। ঠাকুর জিয়ো এতে কষ্ট পেয়ে নিজের বুকের অংশ থেকে সৃষ্টি করলেন এক জোড়া পাতিহাঁস। তিনি তাদের ভিতর আত্মা দিলেন। পাতিহাঁস দুটি মনের আনন্দে ভেসে বেড়াতে থাকলো। হঠাৎ আকাশ থেকে আবার সেই ঘোড়াটি এসে তাঁদের গ্রাস করার চেষ্টা করল। এবার ঠাকুর জিয়ো সর্তক থাকলেন। তিনি আজব ঘোড়াটিকে ধরে সমুদ্রের ফেনায় পরিণত করলেন। সেই ফেনার পানিতে পাতিহাঁস দুটি মনের আনন্দে ভেসে বেড়াতে থাকে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? তাদের আশ্রয়ের জন্য মাটি চাই, চাই বাঁচার জন্য খাদ্য। এ রকম প্রার্থনায় ঠাকুর জিয়ো কাছিমকে নির্দেশ করলেন পানির নিচ থেকে মাটি তুলে আনতে। কাছিম ব্যর্থ হলো। চিংড়িকে বললে সেও চেষ্টা করে সফল হলো না। এভাবে বোয়াল, কাঁকড়া একে একে সবাই ব্যর্থ হলো। রাগান্বিত হয়ে ঠাকুর জিয়ো অবশেষে হুকুম করলেন কেঁচোকে। কেঁচো পানির অতল থেকে মাটি তুলে আনল। এবারে মহাপ্রভু ঠাকুর জিয়ো আনন্দের সাথে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীতে স্থাপন করলেন পাহাড়, অরণ্য সবকিছু। সেখানে পাতিহাঁস দুটি বাসা বাঁধে এবং প্রকৃতির নিয়মেই ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটলে ভিতরে দেখা মিলল দুটি মানবসন্তানের। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম পিলচু হড়ম ও মেয়েটির নাম পিলচু বুড়ী।'

শুধু সৃষ্টিতত্ত্ব কেন? শিকার নিয়েও আদিবাসীদের বিশ্বাসে জায়গা করে নিয়েছে নানা কাহিনী। শিকারসহ যে কোনো অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে এখনো সাঁওতালসহ অন্যান্য আদিবাসীদের একমাত্র অস্ত্র তীর-ধনুক। তাছাড়া নানা পূজা-পার্বণেও এরা তীর-ধনুককে ব্যবহার করছে পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই। তীর-ধনুকের ব্যবহার নিয়ে আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত আছে একটি কাহিনী। গিরিডোবার রাগদা হেমব্রম জানালো কাহিনীটি।

'সাঁওতাল রাজা তখভনের রানীর এক গোপন প্রেমিক ছিল। প্রেমিকটি বনের মধ্যে থাকতো সর্পরাজের বেশ ধরে। রাজা যখন শিকারে যেতেন রানী তখন তাকে জঙ্গলের বিশেষ একটি দিকে যেতে নিষেধ করতেন।

একবার শিকার করতে গিয়ে কৌতূহলবশত রাজা ঐ বিশেষ দিকে যান এবং সর্পরাজকে দেখতে পান। নিজের প্রাণ রক্ষার্থে তীর দিয়ে রাজা হিংস্র সর্পরাজকে মেরে ফেলেন।

শিকার থেকে ফিরে রাজা ঘটনাটি রানীকে খুলে বলে। সর্পরাজের মৃত্যুর কথা শুনে রানী ভিতরে ভিতরে বেশ ব্যথিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণা হয়ে ওঠেন। তিনি রাতের আঁধারে জঙ্গলে গিয়ে সেখান থেকে সর্পরাজের হাড়গোড় কুড়িয়ে এনে বাগানে পুতে রাখেন। কিছুদিন পর ঐ জায়গা থেকে একটি গাছ হয় এবং ঐ গাছে একটি আধ ফোটা ফুল সারা বাগানকে আলোকিত করে তোলে।

প্রতিহিংসাপরায়ণা রানী একবার কৌশলে রাজার সাথে মেতে ওঠেন সর্বনাশা বাজির খেলায়। রাজা যদি বাগানের সব ফুলের নাম বলতে না পারেন তবে, রানীর হুকুমে প্রজারা রাজার প্রাণদণ্ড দেবে। নিজের বাগানের ফুলের নাম বলাটা খুবই সহজ ভেবে আত্মবিশ্বাসী রাজা রাজি হলেন।

অতঃপর গ্রামে গ্রামে ঢোল পিটিয়ে এ খবর সর্বত্র জানিয়ে দেয়া হলো। নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যের প্রজারা 'বাজি খেলা' দেখার জন্য রাজপ্রাসাদের বাগানে উপস্থিত হলো। রাজা একে একে সব ফুলের নাম বলতে পারলেন কিন্তু অদ্ভুত আধফোটা ফুলটির কাছে এসে রাজা আটকে গেলেন। সে সময় রাজার পক্ষে প্রজারা রানীর কাছ থেকে আরো ৭ দিন সময় চেয়ে নেয়। খবর পেয়ে রাজাকে বাঁচাতে অন্য রাজ্য থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হয় রাজার এক বোন। হাঁটতে হাঁটতে ষষ্ঠ রাতে সে বিশ্রাম নিচ্ছিল একটি শিমুল গাছের তলায়। হঠাৎ গভীর রাতে বোনটি শুনতে পায় গাছের মগডালে এক শকুনি তার ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন এই বলে যে, পরদিনই সে বাচ্চাদের জন্য রাজার দেহের মাংস তাদের খাওয়াবে। উৎসুক বাচ্চারা কিভাবে তা সম্ভব মার কাছে জানতে চাইলে গল্পচ্ছলে বাচ্চাদের ঘুম পাড়াতে পাড়াতে সমস্ত ঘটনা এবং ফুলের নাম ও জন্মবৃত্তান্ত খুলে বললো। শিমুল গাছের নিচে বসে রাজার বোনটি সব কথা শুনে ফেললো।

ভোরের মধ্যেই বোনটি রাজার কাছে পৌঁছে ফুলের নামসহ সমস্ত ঘটনাটি বলল। ৭ দিনের দিন রাজা, প্রজা ও রানীর সম্মুখে বললেন, ফুলের নাম হলো, 'কারি নাগিন হাড় বাহা' আর তখনই ফুলটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হলো। রাজা প্রাণদণ্ড হতে মুক্তি পেল।

কিন্তু ক্ষুব্ধ প্রজারা প্রতিহিংসাপরায়ণা রানীকে তীর মেরে ঝাঁঝরা করে দিল এবং তাতেও তাদের ক্ষোভ প্রশমিত না হওয়ায় লাঠির আঘাতে রানীর মাথা গুড়িয়ে দিল।'

সেই থেকে সাঁওতালদের শাকরাৎ-এর সময় কলাগাছে তীর মারে আর লাঠির ঘায়ে হাড়ি ভাঙে। এটিকে এরা অশুভ শক্তির প্রতীকী বিনাশ বলে মনে করে।

কড়া, ভুনজার, ওরাও, তুরি, আর মুণ্ডা সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের সবচেয়ে বড় উৎসব 'করমা বা কারমা পূজা'। মূলত এটি গাছের পূজা। বিরল প্রজাতির 'খিল কদম' গাছের পূজা করে এরা। ভাদ্র-আশ্বিনের অভাবের সময়েই আদিবাসীরা আয়োজন করে এ পূজার। অভাবের সময় পূজা কেন? এ নিয়ে প্রচলিত আছে অভিন্ন এক কাহিনী। হালজায়ের জগেন কড়া জানালো সে কাহিনীটি।

'কারাম আর ধারাম ছিল দুই ভাই। কারাম বড় আর ধারাম ছোট। তাদের একমাত্র আদরের বোনের নাম পারাবেতী। একবার ভাদ্র মাসে গ্রামের এক ধনী ব্যক্তি ঢোল পিটিয়ে তার জমিতে ধান গাড়ার 'হাউলি'র (কাজের বিনিময়ে খাওয়ার দাওয়াত) ডাক দেয়। গ্রামের অন্যদের সাথে কারাম আর ধারামও যায় সেখানে। ভোরবেলা কিছু চারা লাগিয়ে সকালের নাস্তা বা পনতা (পানতা) খেতে দুভাই কলাপাতা নিয়ে বসে যায় লাইনে। কিন্তু কারাম আর ধারামের কাছে এসেই পানতা শেষ হয়ে যায়। পানতা খেতে না পেরে দুভাই বড়ই দুঃখ পায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বড় ভাই কারাম ছোটকে সান্ত্বনা দেয় দুপুরের খাবার পাওয়ার আশায়। দুভাই আবার কাজে ফিরে যায়। ধান গাড়া শেষ হলে দুপুরের দিকে আবারও কলাপাতা নিয়ে অন্যদের সাথে বসে পড়ে লাইনে। কিন্তু এবারও ঘটল একই ঘটনা। তাদের পর্যন্ত এসেই খাবার শেষ হয়ে গেল। এবার তারা খুবই কষ্ট পেল। প্রচণ্ড রাগে ও কষ্টে ছোটভাই চাইল তার গাড়া ধানের চারাগুলো তুলে ফেলতে। বড়ভাই কারাম তাকে শান্ত করে বাড়ির দিকে রওনা হয়। পথেই তাদের দেখা হয় এক বটগাছের সাথে। তাদের দুঃখের কথা শুনে বটগাছ বলে, 'তোদের কারমা কপাল জেড় গেল' (তোমাদের কর্মভাগ্য পুড়ে গেছে)। সে উপদেশ দেয় সাত সমুদ্র লঙ্কা পার হয়ে কর্মভাগ্য নিয়ে আসার। বটগাছের কথা বিশ্বাস করে কারাম আর ধারাম বাড়ি থেকে ক্ষুদভাজা নিয়ে রওনা হয় কর্মভাগ্য আনতে। কিছু দূর যেতেই তাদের সাথে দেখা হয় একটি কুল গাছের। কারাম-ধারামের কথা শুনে সেও জানায় তার দুঃখের কথা। তার ফল পেকে মাটিতে পড়ে থাকে কিন্তু কেউ খায় না।

তার ভাগ্যটিও জেনে আসার জন্য দুভাইকে সে অনুরোধ করে। যেতে যেতেই কারাম-ধারাম এর দেখা হয় একটি ডুমুর গাছের সঙ্গে। ডুমুর গাছ তাদের লঙ্কা পার হওয়ার কথা শুনে দুঃখ করে বলে তার সুদৃশ্য ফল পেকে যায় কিন্তু মানুষ ও পাখি সে দিকে ফিরেও তাকায় না। এ নিয়ে তার অনেক দুঃখ। সে অনুরোধ করে তার ভাগ্যটিও জেনে আসার। কিছুদূর যেতেই কারাম আর ধারামের সামনে পড়ে একটি নদী। নদীর তীরে দুটি হাতি মারামারি করছিল। তাদের পুরো শরীর কাদায় ঢাকা। কারাম-ধারামের কথা শুনে তারা দুঃখ করে বলে তারা জানে না আর কতদিন তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে কাদায় ঢাকা থাকবে। দুভাইকে তারা অনুরোধ করে তাদের ভাগ্যটিও জেনে আসার। নদী পাড় হয়ে কিছুদূর যেতেই কারাম-ধারাম লঙ্কার সমুদ্রের কাছে এসে পৌঁছায়। বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেয়ার চিন্তায় তারা সমুদ্রপাড়ে বসে থাকে। সমুদ্রে একটি বড় কুমিরের গলায় সাতদিন ধরে কাটা বিঁধে থাকায় সে কারাম-ধারামের সাহায্য চায়। সমুদ্র পার করানো ও নিয়ে আসার শর্তে কারাম-ধারাম কুমিরের গলার কাটা বের করে দেয়। কুমিরের পিঠে চড়ে দুভাই লঙ্কার সমুদ্র পার হয়েই দেখা পায় কর্মভাগ্যের। কর্মভাগ্যের সারা শরীর তখন



পূজার আনন্দে শঙ্খ বাজাচ্ছে আদিবাসী শিশুরা

পোকায় খাচ্ছিল। কারাম-ধারাম যখনই তা স্পর্শ করল তখনই সেটা গাছ হয়ে গেল। কারাম-ধারামের মধ্যে অন্য রকম শক্তির সঞ্চার হলো। তারা সেই গাছ ঘাড়ে নিয়ে ফিরতে থাকলো।

ফেরার পথে হাতি দুটি তাদের ভাগ্যের কথা জানতে চাইলে কারাম-ধারাম বলল তোমাদের এমন একজন লাগবে যে তোমাদের শরীর পরিষ্কার করে দিবে। হাতি দুটি তাদেরকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার মিনতি করলো। কারাম-ধারাম তখন দুই হাতির পিঠে চড়ে বসল। এরপর ডুমুর গাছ তার ভাগ্যের কথা জানতে চাইলে তারা বলল, তোমার গোড়ার মাটির নিচে সাত কলসি ধন আছে সেটি সরালেই তোমার ফল সবাই খাবে। ডুমুর গাছ কারাম ধারামকে সাত কলস ধন তুলে নেয়ার অনুরোধ করল। তারা সাত কলস ধন হাতির পিঠে তুলে নিল। কুল গাছের সাথে দেখা হতেই কারাম-ধারাম তাকেও একই কথা বলল। সেও তার গোড়ার মাটির নিচের সাত কলস ধন তুলে নেয়ার মিনতি করল। কারাম-ধারাম তাই করল। এভাবে তারা কর্মভাগ্য নিয়ে সেই বট গাছের কাছে চলে আসল। বট গাছ লঙ্কা পার হয়ে আনা কর্মভাগ্যরূপী গাছটিকে মাটিতে গেড়ে তাদের বোন পারাবেতীকে এনে পূজা করার নির্দেশ দিল। সে সময় থেকেই কারমা পূজার প্রচলন হয় এবং গাছটির নামকরণ হয় 'কারমা গাছ'।

আদিবাসীরা আজো বিশ্বাস করে কারমা পূজা তাদের অভাবমুক্তি আর সৌভাগ্য লাভের পূজা।

নানা বিশ্বাসের মিথগুলো আদিবাসী সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। কাহিনীগুলোতে আদিবাসীদের মননশীল উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ যেমন ঘটেছে তেমনি আদিবাসী সমাজ ও সাহিত্যকে করেছে আকর্ষণীয়। দরিদ্রতা আর নানা বৈষম্যের স্বীকার আদিবাসীরা দিন দিন হারিয়ে ফেলছে নিজের জাতিসত্তাটুকুকে। ফলে নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে গল্পের মতো মিথগুলো।

সাপ্তাহিক, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০

মৃত্যু ছিল না যে সম্প্রদায়ে

বহবলদিঘিতে আদিবাসীদের মধ্যে টান টান উত্তেজনা। আদিবাসীরা জোটবদ্ধ হয়েছে একটি কবরস্থানকে দখলমুক্ত করতে। গ্রামের যুবক বয়সীরা তৈরি হচ্ছে তীর-ধনুক নিয়ে। চারদিকে থমথমে পরিবেশ। খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন, চেয়ারম্যান আর সাংবাদিকরা চলে আসেন ঘটনাস্থলে। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে তাৎক্ষণিকভাবে দখলমুক্ত করে আদিবাসীদের কবরস্থানটিকে। বিজয়ের স্বাদ নিয়ে আনন্দে আদিবাসীরা ফিরতে থাকে নিজ নিজ ঘরে।

পশ্চিম আকাশে সূর্য তখন হেলে পড়েছে। চারদিকে স্নিগ্ধ লাল আলোর কোমল ছোঁয়ায় বদলে যাওয়া পরিবেশ। ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে চারদিকে। কবরস্থানের পাশের একটি খোলা মাঠে বসে আছে এক বৃদ্ধ। বয়স নিদেন পক্ষে নব্বই তো হবেই। কবরস্থানের দিকে তাকিয়ে এক দৃষ্টিতে কি যেন ভাবছে সে। আমরা এগোতে থাকি তার দিকে। আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় নিপেন টিগ্‌গা। এখানকার ওরাও গোত্রের মহত সে। নিপেন জানালো বৃদ্ধটি তাদের গোত্রেরই সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। নাম শংকর টিগ্‌গা। নিপেন গোত্রপ্রধান হলেও শংকরের পরামর্শ তাদের কাছে সবসময় অগ্রাধিকার পায়।

শংকর টিগ্‌গার পাশে আরাম করে বসি ঘাসের মধ্যে। আমাদের আগমন টের পেয়ে শংকর মুখ তুলে তাকায় নিপেনের দিকে। চামড়ায় ভাঁজ খাওয়া শরীর কাঁপিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'আমাদের সমাজে কোনো মৃত্যু ছিল না'। বৃদ্ধের কথা শুনে আমাদের চোখ স্থির হয়ে যায়। কিন্তু নিপেন বেশ স্বাভাবিক। খানিক মুচকি হেসে নিপেন বলতে থাকে মৃত্যু রহস্য নিয়ে ওরাওদের নানা বিশ্বাসের কথা।

আদিকালে ওরাও আদিবাসীদের জীবনে কোনো মৃত্যু ছিল না। শিশু,

যুবক, বৃদ্ধ কেউ মৃত্যুবরণ করত না তখন। এভাবেই চলতে থাকল। বেশ কিছুদিন পর মৃত্যু না থাকাতে অসুবিধা দেখা দিল থুড়থুড়ে বৃদ্ধদের নিয়ে। বৃদ্ধদের চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া সবকিছুর জন্য তখন আরেকজনের সহায়তা লাগত। তখন ওরাও বৃদ্ধ সমাজ চিন্তা করল এ রকম কষ্ট আর অন্যের সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই, এর চেয়ে মৃত্যুই ভালো। সমাজের সকলেই এ ব্যবস্থায় একমত হলেন।

ওরাওদের ভগবানের নাম ধার্মেশ। ওরাওদের কাছে ধার্মেশ সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা—সকলে মিলে তখন ভগবানের কাছে গেল। সকলে একবাক্যে ধার্মেশকে বললেন, 'ভগবান, আমাদের মাঝে মৃত্যু দাও।' ধার্মেশ বললেন, 'তোমরা কি সকলের জন্যই মৃত্যু চাও।' উত্তরে সবাই বলে, 'না, যারা বৃদ্ধ তাদের জন্য শুধু মৃত্যু দাও।' দেবতা ধার্মেশ তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন। ওরাওদের বিশ্বাস সে থেকেই পৃথিবীতে মৃত্যুর আবির্ভাব হয়েছে।

তাহলে অন্য বয়সীদের কেন মৃত্যু হয়? এ রকম প্রশ্নে নিপেনের উত্তর, 'মানব সমাজে পাপের কারণে আত্মার পবিত্রতা নষ্ট হয়। আর এই অপবিত্র আত্মা তখন দেবতা ধার্মেশের কাছে চলে যায় এবং মৃত্যু কামনা করে। ফলে তখনই মানুষের শরীরে রোগ-ব্যাধি দেখা দেয় এবং দেহের মৃত্যু ঘটে।' বেশ অবাক হয়ে শুনতে থাকি নিপেনের কথাগুলো।

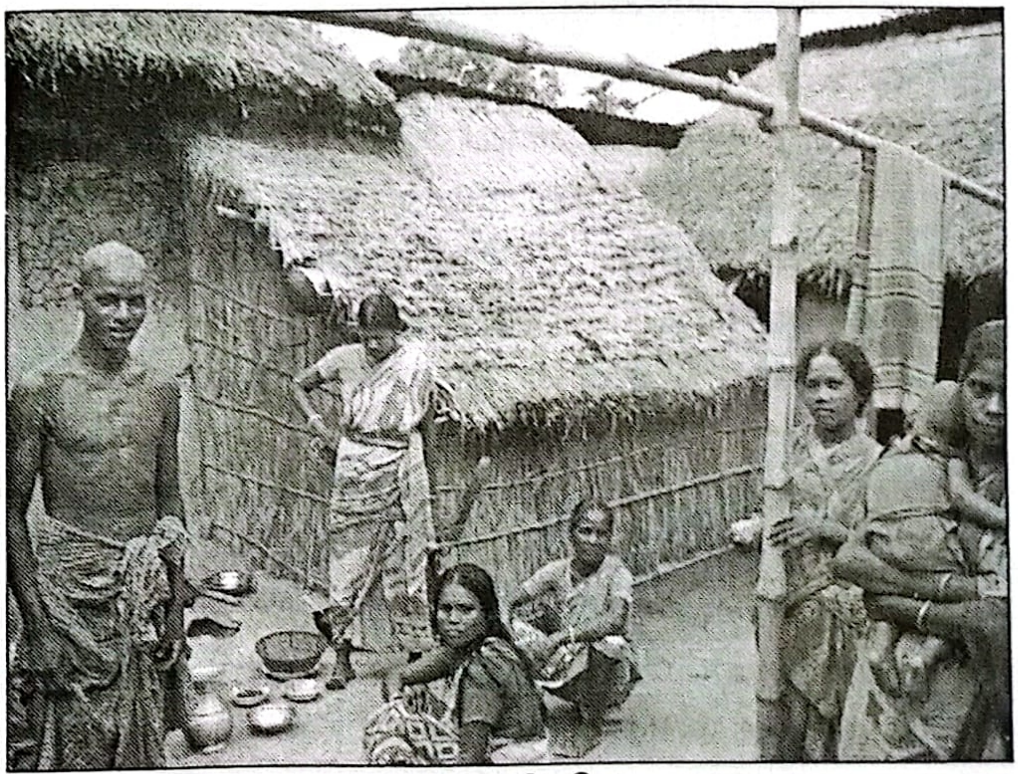
আদিবাসী ওরাওরা তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের শক্তিতে বিশ্বাস করে। ওরাও ভাষায় এটি 'পাকবলার'। এর অর্থ 'অশরীরী আত্মা'। এদের বিশ্বাস পূর্বপুরুষদের আত্মার এই শক্তিই তাদের ভালো আদিবাসী এবং আদর্শ ঐক্যের পথে শক্তি জোগায়। বেঁচে থাকা ওরাওদের জন্য মৃতরা তাদের আশীর্বাদ রেখে যায়। তাই এরা মৃতদের ভক্তি করে। ভাত খেতে বসে এরা ভাতের কিছু অংশ পূর্বপুরুষদের নামে উৎসর্গ করে। কখনো কখনো নবজাতকের নাম রাখা হয় পূর্বপুরুষদের নামে, যাতে তাঁর আশীর্বাদ পাওয়া যায়।

নিপেন জানালো ভূমিকম্প নিয়ে ওরাওদের প্রচলিত বিশ্বাসটি—তারা মনে করে পৃথিবী একটি কচ্ছপের পিঠের ওপর। কেঁচো পাতাল থেকে মাটি তুলে কচ্ছপের পিঠে ফেলে মই দিয়ে ঐ মাটি সমান করে দেয়। এ কারণে পৃথিবীর কোথাও সমতল, কোথাওবা পাহাড়-পর্বত। কচ্ছপের মুখের

সামনে নাগিনী সাপ ফণা তুলে থাকে। যাতে কচ্ছপ নাড়াচড়া না করতে পারে। কচ্ছপ নাড়াচড়া করলেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

ফোকলা হাসির শংকর টিগ্‌গা বলল, 'আমরা তো বানর গোত্রের'। কথা শুনে সকলের দৃষ্টি তখন শংকরের দিকে। মজার সব তথ্য জানাতে থাকে শংকর টিগ্‌গা। ওরাওদের কাছে গোত্র মহামূল্যবান। তাদের কাছে একই গোত্রের সকলেই ভাইবোন। ফলে এক গোত্রের মাঝে বিয়ে সম্পন্ন নিষিদ্ধ এবং পাপের সমতুল্য। ওরাওদের রয়েছে বিশটি গোত্র। নানা প্রাণি ও বস্তুর নামেই নামকরণ হয়েছে গোত্রগুলোর। যেমন : টিগ্‌গা অর্থ বানর, বাণ্ডো অর্থ বনবিড়াল, বাড়া অর্থ বটগাছ, বাঁড়োয়া অর্থ বন্যকুকুর, বাখলা অর্থ এক প্রকার ঘাস, বেক অর্থ লবণ, কেরকোটা অর্থ চড়ুই পাখি, কিণ্ড অর্থ এক প্রকার মাছ, কিসপট্রা অর্থ শূকরের নাড়িভুঁড়ি, কুজুর অর্থ এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ, লাকড়া অর্থ বাঘ, মিঞ্জি অর্থ এক প্রকার মাছ, পান্না অর্থ লোথা, তির্কী অর্থ এক জাতীয় মাছ, টপ্প অর্থ এক জাতীয় পাখি, খাখা অর্থ এক জাতীয় কাক, খালখো অর্থ এক জাতীয় মাছ, খেস অর্থ ধান।

শংকর বেশ আগ্রহ নিয়ে বলতে থাকে ওরাওদের পূর্বপুরুষদের সময়কার সামাজিক ব্যবস্থার কথা। বেশ অবাক হয়ে শুনছিলাম সবকিছু।



বাড়ির উঠানে আড্ডারত ওরাও সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা

ওরাও গ্রামের নানা বিবাদ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে গ্রাম সংগঠন ছিল তাকে বলা হতো 'পাঞ্চেস'। গ্রামের বয়স্ক সাত-আটজনকে নিয়ে গঠিত হতো পাঞ্চেস। প্রতিটি গ্রামে একজন হেডম্যান বা মাহাতো এবং একজন পুরোহিত বা নাইগাস থাকত। পাঞ্চেসের উপরের সংগঠনের নাম ছিল পাঁড়হা। পাঁড়হা সাধারণত সাত থেকে বারোটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো। এ সকল গ্রামের হেডম্যানদের পক্ষ থেকে একজন পাঁড়হা প্রধান নিযুক্ত হতো। তাকে বলা হতো পাঁড়হা রাজা। কোনো অভিযোগকারী যদি পাঞ্চেসের বিচারে সন্তুষ্ট না হয়, তবে সে পাঁড়হায় আপিল করতে পারতেন।

এরই মধ্যে পাশে এসে বসেন রবাট। তিনি বহুদিন যাবৎ কাজ করছেন এ অঞ্চলের আদিবাসীদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য। রবাট জানালেন এদেশে ওরাওদের আগমনের নানা তথ্য।

ওরাওরা এ উপমহাদেশের ভূমিজ সন্তান। তারা বাইরে থেকে এ উপমহাদেশে আসেনি। এদের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে। ওরাওদের আদিস্থান দক্ষিণ ভারতের ডক্কানের কংকা নদীর তীরে। শরৎচন্দ্র রায়, পি দেহান এবং কর্নেল ডালটন এই মত প্রকাশ করেন। তাদের মতে, ওরাওরা বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে কংকা নদীর উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করে এবং কনাটকায় কিছুকাল বসবাস করে। পরে পশ্চিম অববাহিকা হয়ে ওরাওরা অমরকন্টক ফরেস্ট রেঞ্জে এসে পৌঁছায়। ওরাওদের লোককাহিনীতেও এই তথ্যের সত্যতা মেলে। রবাট বলতে থাকেন। আবার মহলি লিবিন তির্কীর মতে, খ্রিস্ট জন্মের ৩৫০০ বছর ওরাওরা সুতলেজ নদীর অববাহিকায় হরপ্পা অঞ্চলে বাস করত। খ্রিস্ট জন্মের ১৭৫০ বছর আগে হরপ্পা থেকে ওরাওরা শাহাবাদের রোহটাস অঞ্চলে চলে আসে যা বর্তমানে হরিয়ানা এবং যমুনার সমতলভূমি হিসেবে পরিচিত। সে হিসেবে বলা যায় ওরাওরা বর্তমানে আজমগড়ে এবং মির্জাপুরে বসতি স্থাপন করেছে। রবাটের তথ্য মতে, শারীরিক গঠন ও ভাষাগত বিচারে ওরাওরা দ্রাবিরিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত। দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, মালায়লাম, কানারিজ সবই দ্রাবিরিয়ান গোষ্ঠীর লোক। রবাট জানালেন ভারতবর্ষ ভাগের পূর্বেও দিনাজপুরে বহুসংখ্যক ওরাওগোষ্ঠীর বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন দলিলে। অথচ নানা কারণে আজ শুধু

দিনাজপুর নয়, গোটা দেশেই আদিবাসী ওরাওদের সংখ্যা কমে গেছে প্রবলভাবে। রবাটের তথ্য আমাদের ব্যথিত করে। ধীরে ধীরে আমরা হারিয়ে ফেলছি একটি জাতিকে। হারিয়ে যাচ্ছে একটি ভাষা আর সংস্কৃতি।

ওরাও জাতি বেশ স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন। তারা চায় গোত্রের সকলেই সমান থাকুক এবং কেউ যাতে আরেকজনকে পেছনে ফেলে বড় না হয়। পূর্বপুরুষদের সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব এখনো রয়েছে ওরাওদের মধ্যে। এ বিষয়ে ওরাওদের মধ্যে প্রচলিত আছে একটি কাহিনী। নিপেন টিগ্গা জানালেন কাহিনীটি।

ওরাও সমাজ প্রবীণদের দ্বারা গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হতো। কিন্তু একটি দেশ পরিচালনার জন্য তো কাউকে না কাউকে রাজা নির্বাচন করতে হবে। তাহলে তো সাম্যবাদরীতি থাকবে না। এ ক্ষেত্রে ওরাওরা কি করবে? সে সময় তারা এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিল। বাইরের একজনকে তারা রাজা বানাল। তার নাম ফনি মুকুট রায়। তিনি ছিলেন নাগবংশী সম্প্রদায়ের এবং আদিবাসী (রাজা নিয়োগের ক্ষেত্রে মুণ্ডা এবং অন্য আদিবাসীদেরও ভূমিকা ছিল)। তবে তিনি রাজা ছিলেন নামমাত্র। প্রজারা উপহার হিসেবে যা দিতেন, তাই তিনি নিতেন। আদিবাসীদের কোনো কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করতেন না। দীর্ঘদিন স্বাধীনভাবেই চলছিল ওরাওদের পাঞ্চেস ও পাঁড়হাগুলো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাজা বাধ্যতামূলক কর প্রথা চালু করেন। ফলে ওরাও সমাজে হিন্দু ও বাইরের প্রভাব জোরদার হতে থাকে। রাজার সঙ্গে ওরাওদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে চরমভাবে। এ অবস্থা চলে প্রথম শতাব্দী থেকে ষোল শতাব্দী পর্যন্ত।

এরই মধ্যে সূর্য ডুবেছে পশ্চিম আকাশে। চারদিকে নেমেছে অন্ধকার। ঝিঁঝিঁ ডাকছে দল বেঁধে। আসর ভেঙে আমরাও রওনা হই বাড়িমুখো। অসমাপ্ত থেকে যায় আমাদের কথাগুলো। হয়ত এভাবেই অসমাপ্ত থেকে যাবে একটি জাতির গৌরবগাথা কাহিনীগুলো।

সাপ্তাহিক ১৪ অক্টোবর ২০১০

আদিবাসী শিশুশিক্ষা : বাংলা ভাষার জাঁতাকলে

কথা বলতে বলতেই পলাশ কিছুটা ক্ষেপে যায়। যে দেশে নিজের বাংলাভাষাই ঠিক রাখা যায় না সেখানে আবার আদিবাসীদের ভাষা। দেশের প্রতি এক প্রকার দায়িত্ববোধ থেকেই হতাশা নিয়েই কথাগুলো বলে সে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র পলাশের কথাগুলো একেবারেই অমূলক নয়। বাংলাভাষাকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল সালাম, বরকাত, রফিক, শফিক, জব্বারদের। অথচ এদেশেরই গণমাধ্যমগুলোতে এখন বিকৃত করা হচ্ছে বাংলাভাষাকে। সস্তা বিনোদনের প্রলোভনে ভাষা বিকৃত হচ্ছে নানা ঢংয়ে। সেগুলো প্রচার হচ্ছে নাটক আর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আর বেসরকারি রেডিওর আরজেদের কথা তো বাদই দিলাম। এ সকল বিনোদনের গোলকধাঁধায় যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সবাই। বাংলাভাষাকে এক বিকৃত ঢংয়ে বলার প্রবণতা সহজেই ছড়িয়ে পড়েছে তরুণ আর যুবকদের মুখে মুখে। ফলে নিঃশব্দে বিকৃত হচ্ছে রক্ত দিয়ে পাওয়া প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা।

আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসটি আজ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখটি সারা বিশ্ব উদ্‌যাপন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ভাষা আন্দোলনের দেশেই আদিবাসী শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ থেকে। এ যেন মোমবাতির নিচের অন্ধকারের মতো অবস্থা।

এ বছরে পঞ্চম শ্রেণীর প্রাক-সমাপনী পরীক্ষা দেখতে গিয়েছিলাম দিনাজপুরের আদিবাসী এলাকার কেন্দ্রগুলোতে। কালিয়াগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রটি ছিল একেবারে সীমান্ত ঘেঁষা। এ এলাকাটিতে মূলত নানা আদিবাসীদের বাস। শালবনকে ঘিরে পাড়া ভেদে বাস করছে আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা পাহান, ওরাও, ভুনজার, কড়া আর তুরি

সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা। ফলে আদিবাসীদের সংখ্যাই বেশি। পরীক্ষা কেন্দ্রের সচিবের দায়িত্বে থাকা ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানালেন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাটি। কেন্দ্রটিতে ৩৩৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ঐ কেন্দ্রে আদিবাসী শিশু পরীক্ষা দিচ্ছে মাত্র ১০জন। এদের মধ্যে ৭ জনই সাঁওতাল আর বাকিরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের। আদিবাসী এলাকা হওয়া সত্ত্বেও আদিবাসী শিশুদের এমন রুগ্‌ণ অংশগ্রহণ আমাদের অবাক করে।

টিফিন বিরতির পরই শুরু হবে ধর্ম পরীক্ষা। এই ফাঁকে কথা চলে তাদের সঙ্গে। জানা গেল দুজন বাদে এদের অধিকাংশ পরিবারই ধর্মান্তরিত হয়ে ইতোমধ্যেই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এরপর কি পরীক্ষা? প্রশ্ন করতেই একযোগে উত্তর, 'ধর্ম'। অবাক বিষয় হলো ধর্মান্তরিত হওয়া পরিবারের শিশুরাও পরীক্ষা দিচ্ছে হিন্দু ধর্মের প্রশ্নে। অভাবের কারণে ধর্মান্তরিত হলেও শিশুদের মন থেকে তখনো বিলীন হয়নি তাদের চিরচেনা সনাতন হিন্দু রীতি।

মুণ্ডা পাহান সম্প্রদায়ের সুদেব পাহানের জন্য টিফিন নিয়ে এসেছে তার বাবা খোসকা পাহান। তার বাড়ি গোদাবাড়ী গ্রামে। একেবারে সীমান্ত



ছবির মতোই বেহাল দশায় আদিবাসী শিশুশিক্ষা

রাঙ্গামাটি

ঘেঁষা প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তিনি জানলেন সুদেব পাহানের শিক্ষা নিয়ে নানা তথ্য। চরম দারিদ্র্যতার মাঝে টিকে আছে গোদাবাড়ী গ্রামের ২০টি মুণ্ডা পাহান পরিবার। এরা কথা বলে আদিবাসী সাদরী ভাষায়। মুণ্ডা ভাষায় মায়ের ঘুম পাড়ানি গান আর বাবার বকুনি খেয়েই বেড়ে ওঠে সুদেব। পূজার উৎসবে আদিবাসী গানের তালে নেচে গেয়ে আনন্দের ছোঁয়ায় বড় হয় সে।

সুদেবের বয়স যখন ছয় তখন স্কুলে যেতে বাদসাধে তার বাবা। বাবা খোসকা পাহানের ইচ্ছা ছেলে কাজে যাবে তার সঙ্গে। ফলে সংসারে বাড়তি আয় আসবে। সংসার ভালো চলবে। কিন্তু সুদেবের মায়ের স্বপ্ন ভিন্ন। তার ছেলে শিক্ষিত হয়ে বড় হবে। কেউ তাকে ঠকাতে পারবে না। সুদেব আলো জ্বালাবে পাহান গ্রামে। পাহান জাতির সম্মান বাড়বে। স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্যের এক পর্যায়ে সুদেবকে স্কুলে যাওয়ার সম্মতি দেয় খোসকা পাহান। বুক ভরা আশা নিয়ে সুদেবকে ভর্তি করা হয় স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে।

প্রথম দিনেই সুদেবের কচি মনের হাসি-আনন্দ উবে যায়। তার মনে জায়গা করে নেয় অজানা আতঙ্ক। যে মুণ্ডা ভাষায় হেসে খেলে সে বড় হয়েছে। সুদেব দেখলো সে ভাষার প্রচলন নেই তার স্কুলে। এমনকি ঐ ভাষা জানা কোনো শিক্ষকও নেই। ফলে তার ওপর আরোপ হয় অজানা এক বাংলা ভাষা। যার সে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। স্কুলের বাঙালি শিক্ষকদের পক্ষেও সম্ভব হয় না তাকে বোঝানো।

এভাবেই চলতে থাকে কয়েকদিন। একে তো ভাষার ভীতি তার ওপর ক্লাসের বন্ধুদের আচরণে সুদেব একেবারেই মুষড়ে পড়ে। আদিবাসী বলে তাকে বসতে হয় আলাদা এক বেঞ্চিতে। কেউ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় না। সবাই তাকে আড়চোখে দেখে।

সুদেবের বাবা-মা লেখাপড়া না জানায় তাদের পক্ষেও সম্ভব হয় না সুদেবকে সাহায্য করা। ফলে নানা ভীতি ভর করে সুদেবের মনে। স্কুলে যাওয়া তার কাছে রীতিমতো আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে প্রথম পরীক্ষায়ই ফেল করে সে। স্কুলের দুর্বল ছাত্রের তালিকায় নাম ওঠে তার। কেউ বুঝতে পারে না সুদেবের পিছিয়ে পড়ার কারণ। ক্রমেই সুদেব হারিয়ে ফেলে স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ।

মা ভারতীয় পাহান সুদেবকে ভর্তি করে দেয় নিকটবর্তী একটি ব্র্যাক স্কুলে। যেখানে শিক্ষক হিসেবে ছিল আদিবাসী একজন। তিনি সুদেবকে তার মাতৃভাষায় সব বোঝাতে থাকেন। মাতৃভাষার ছোঁয়ায় সুদেবের ভীতি ক্রমেই কেটে যেতে থাকে। ক্রমেই অন্য ভাষাকে আয়ত্ত করতেই সুদেব হয়ে ওঠে ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। এভাবেই সুদেব পার করে দেয় ৪টি ক্লাস। আজ সে পঞ্চম শ্রেণীর প্রাক-সমাপনী পরীক্ষা দিচ্ছে। সুদেবের একই ঘটনাটিতে গোটা বাংলাদেশের আদিবাসী শিশুশিক্ষার একটি নমুনা পাওয়া যায়। হয়তো এভাবেই সারাদেশে আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা আজ এনজিওদের হাতে চলে এসেছে। আর সরকার একেবারেই নিশ্চুপ।

দিনাজপুরের আরেক প্রত্যন্ত অঞ্চল ঝিনাইকুড়ি। সেখানে রয়েছে আদিবাসী কড়া সম্প্রদায়ের লোকেরা। ঝিনাইকুড়িতে যাওয়ার ভঙ্গুর পথই বলে দেয় গ্রামের কর্তাব্যক্তিদের নজর পড়েনি এখানটায়। অথচ এই ঝিনাইকুড়িতেই কোনো রকমে টিকে আছে আদিবাসী কড়া সম্প্রদায়ের মাত্র ১৬টি পরিবার। এ গ্রামে আদিবাসী শিশু রয়েছে ২৫টির মতো। এ বয়সে যাদের স্কুলে যাওয়ার কথা। অথচ বাবা-মার সঙ্গে তারা ছুটছে কাজের সন্ধানে।

কড়া সম্প্রদায়ের একমাত্র শিক্ষিত যুবক কৃষ্ণ কড়া। সে পড়েছে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত। কৃষ্ণ জানাল, কিছুদিন আগেও তাদের গ্রামে আরডিআরএস নামক একটি এনজিওর শিশুশিক্ষা কেন্দ্র ছিল। কৃষ্ণ নিজেই শিক্ষক হিসেবে সে স্কুলে বাচ্চাদের পড়াতেন। এনজিওদের প্রকল্পভিত্তিক মারপ্যাঁচে হঠাৎ করেই স্কুলটিকে সরিয়ে নেয়া হয় অন্যগ্রামে। ফলে কড়া শিশুরা পড়ে থাকে নিরক্ষরতার আঁধারে। এভাবেই শিক্ষা বঞ্চিত হয় আদিবাসী শিশুরা।

শিক্ষার অধিকার মানুষের স্বীকৃত একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ১৯৫৭ সালের ৫ জুন ৪০তম অধিবেশনে ১০৭নং কনভেনশনে আদিবাসী ও উপজাতীয় ভাষা বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে কিছু নীতিমালা তৈরি করে এবং এ কনভেনশনে বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী অন্যতম দেশ।

কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ২১-এ উল্লেখ রয়েছে 'সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জাতীয় জনসমষ্টির অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে সকল স্তরে শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।'

অনুচ্ছেদ ২৩(১)-এ উল্লেখ রয়েছে 'সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের তাদের মাতৃভাষায় পড়তে ও লিখতে শিক্ষাদান করতে হবে। কিংবা যেখানে এটা সম্ভব নয়, সেখানে তাদের সমগোত্রীয়দের মধ্যে সাধারণভাবে বহুল প্রচলিত ভাষায় শিক্ষাদান করতে হবে।'

অনুচ্ছেদ ২৩(২)-এ উল্লেখ রয়েছে 'মাতৃভাষা বা আদিবাসী ভাষা থেকে জাতীয় ভাষা কিংবা দেশের একটি অফিসিয়াল ভাষায় ক্রমান্বয়ে উত্তরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'

এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষরিত 'আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ'-এর ৩০ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে, যে সব দেশে জাতিগোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত সংখ্যালঘু কিংবা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে, সেসব দেশে ঐ ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত বা আদিবাসী শিশুকে সমাজে তার নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ, নিজস্ব ধর্মের কথা ব্যক্ত ও চর্চা করা, তার সম্প্রদায়ের অপরাপর সদস্যদের সঙ্গে ভাষা ব্যবহার করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।'

এদেশে চুক্তিগুলো পড়ে থাকে কাগজের ভাঁজে। ফলে নানা ভাষাভাষির আদিবাসীদের মাঠে নামতে হয় নিজেদের মাতৃভাষাকে টিকিয়ে রাখতে, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের জন্য। এ বড়ই পরিতাপের বিষয়।

সরকার সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে নানামুখী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অথচ মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ আদিবাসী শিশু স্কুলে যায়। যাদের মধ্যে বড় একটি অংশ অল্প সময়ের মধ্যেই ঝরে পড়ে। তাই প্রয়োজন আদিবাসীদের ভাষাকে টিকিয়ে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা। একই সঙ্গে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, আদিবাসী এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন, আদিবাসী এলাকার স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি। এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নে প্রয়োজন শুধুই সরকারের আন্তরিকতা।

আমরা চাই না সুদেব পাহানের মতো আদিবাসী শিশুদের 'পিছিয়ে পড়া' বলে অপবাদ দিতে। আমরা চাই রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে টিকিয়ে রাখার গৌরবময় এই দেশে আদিবাসী শিশুরা শিক্ষালাভ করুক তার চিরচেনা মায়ের ভাষায়।

সাপ্তাহিক ২১ অক্টোবর ২০১০

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র
গ্রন্থাগার
রাঙ্গামাটি